يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

হে মুমিনগণ

O Ye Who Believe

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

www.nagorikpathagar.org

হে মুমিনগণ

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন
নাফিসা প্রকাশনী

প্রকাশক ঃ
নাফিসা ইয়াসমিন শিপু
১৫১/গ, ওয়াপদা রোড, পশ্চিম রামপুরা,
ঢাকা, ফোন ঃ ০১৭ ১৭৮১১৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ২০০২
পৌষ - ১৪০৮
শাওয়াল - ১৪২২

প্রচ্ছদ ঃ
শিল্পকোণ, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা

প্রাপ্তি স্থানঃ
আহসান পাবলিকেশন্স
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
প্রফেসর্স বুক কর্ণার
মগবাজার, ঢাকা
সন্ধানী লাইব্রেরী
চৌমুহনী, নোয়াখালী
প্রীতি প্রকাশন
মগবজার, ঢাকা
তাসনিয়া বই বিতান
মগবাজার, ঢাকা
বি আই এ লাইব্রেরী
৪৩ দেওয়ানজি পুকুর লেন
চট্টগ্রাম
এবং সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

মূল্য ঃ ৬০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

যারা
নিজেদের জীবন
কোরআনের আলোকে
গড়তে চান

www.nagorikpathagar.org

সম্মানিত পাঠকের প্রতি বিনীত নিবেদন

আল্ কুরআনের কোথাও কোন ভুল নেই- "লা রাইবা ফি-হে" কিন্তু কুরআনের মত ঘোষণা করার দুঃসাহস আমার নেই যে, এ বই-এ কোন ক্রুটি নেই। যদিও এগুলো কুরআনেরই সে সমস্ত আয়াত- সমগ্র কুরআনে যেগুলোতে মুমিনদেরকে সরাসরি আহ্বান করেই কিছু আদেশ কিছু নিষেধ করা হয়েছে। তাই বলে এটাই পূর্ণ কুরআন নয় বরং কুরআনের অংশ বিশেষ। এগুলো জানার আগ্রহ প্রত্যেক মুমিনের রয়েছে এবং নিজেদেরকে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গড়তে হলে এগুলো জানার কোন বিকল্প নেই। তারপরেও মনে রাখতে হবে এটা মূল আয়াতের সাথে বাংলা অনুবাদ ও কিছু তাফসীর তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এতে কোথাও কোন ভুল ক্রুটি ধরা পড়লে অথবা আপনাদের কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

পূর্ণ কুরআন অধ্যয়ন করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। যদিও মুসলমান হিসেবে এটা আমাদের প্রধান কর্তব্য। কারণ কুরআন থেকে সরে গেলে আমরা ইসলাম থেকে, ঈমান থেকে দূরে সরে যাব। রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতকে আকাড়িয়ে থাকাই আমাদের সঠিক পথ প্রাপ্তির একমাত্র মাধ্যম। সেই পথের কিছুটা দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। এই বইতে কুরআনের দৃষ্টিতে করণীয় ও বর্জনীয়ের অধিকাংশই আমরা জানতে পারব। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর কুরআন থেকে সঠিক হেদায়েত দান করুন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল করুন। এই মুনাজাত করছি-

মুহাম্মদ মোতাহার হোসাইন

গ্রাম ঃ দেবপুর, সোনইমুড়ি, নোয়াখালি

ফোন ঃ মোবাইল - ০১৭ ৮৬৮৯৬২

০৩১ ৭২৭১৬৬

www.nagorikpathagar.org

একনজরে হে মুমিনগণ

দ্ব্যার্থবোধক শব্দ পরিহার কর (বাকারা-১০৪) - ৯

নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর (বাকারা-১৫৩) - ৯

পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর (বাকারা-১৭২) - ১০

কিসাসের আইন মেনে চল (বাকার-১৭৮) - ১০

রোজা রাখ তাকওয়া অর্জন কর (বাকারা-১৮৪) - ১২

পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর (বাকারা-২০০০ - ১৩

পরকালে ক্রয় বিক্রয় হবে না, বন্ধুত্ব ও
সুপারিশ কাজে আসবে না (বাকারা-২৫৪) - ১৪

অনুগ্রহ প্রকাশ করে, কষ্ট দিয়ে দান-খয়রাত
নষ্ট করো না (বাকারা-২৬৪) - ১৫

সম্পদ থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করা (বাকারা-২৬৭) - ১৫

সুদের বকেয়া পরিত্যাগ কর (বাকারা-১৬) - ১৬
(সুদ গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা)

লেন-দেন লিপিবদ্ধ কর এবং সাক্ষী রাখ (বাকারা-২৮২) - ১৭

আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর (আল ইমরান-১০২) - ১৯

মুমিন ছাড়া কাউকে অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না (আল ইমরান-১২৮)- ২০

সুদ খেয়ো না (আল ইমরান-১৩০) - ২১

কুফরীর পথ অবলম্বনকারীর অনুসরণ করোনা (আল ইমরান-১৪৯) - ২১

কাফিরদের মত কথাবার্তা বলোনা (আল ইমরান-১৫৬) - ২২

সবর, মুসাবারাহ, মুরাবাতাহ ও তাকওয়া অবলম্বন কর (আল ইমরান-২০০) - ২৩

বিধবা ও স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ কর (নিসা-১৯) - ২৪

একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না (নিসা-২৯) - ২৬

সুস্থ মস্তিষ্কে ও পবিত্র অবস্থায় নামাজ পড় (নিসা-৪৩) - ২৬

আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত
ব্যক্তিদের আনুগত্য কর (নিসা-৫৯) - ২৮

শত্রুর মুকাবিলায় সব সময় প্রস্তুত থাক (নিসা-৭১) - ৩০

অপরিচিতদের মুসলিম দাবীর সত্যতা যাচাই কর (নিসা-৯৪) - ৩০

নিজের বিরুদ্ধে গেলেও ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর (নিসা-১৩৫) - ৩২

আন্তরিকভাবে ঈমান আন (নিসা-১৩৬) - ৩৩

www.nagorikpathagar.org

২৬. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ঈমানের বিরুদ্ধে
সুস্পষ্ট দলিল (নিসা-১৪৪) - ৩৪
২৭. অংগীকার রক্ষা কর, হালাল হারাম মেনে চল (মায়েদা-১) - ৩৫
২৮. পূণ্যের কাজে সহযোগিতা কর পাপের কাজে
সহযোগিতা করো না (মায়েদা-২) - ৩৭
২৯. অজু, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন কর (মায়েদা-৬) - ৩৯
৩০. কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে ন্যায় বিচার ত্যাগ করো না (মায়েদা-৮)- ৪০
৩১. আল্লাহর উপর ভরসা কর (মায়েদা-১১) - ৪৩
৩২. জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর (মায়েদা-৩৫) - ৪৩
৩৩. ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না (মায়েদা-৫১) - ৪৪
৩৪. মুমিনদের প্রতি বিনয় নম্র হও কাফেরদের প্রতি কঠোর হও (মায়েদা -৫৪) - ৪৫
৩৫. তোমাদের ধর্মকে উপহাসকারীদেরকে বন্ধু হিসেবে
গ্রহণ করো না (মায়েদা-৫৭) - ৪৭
৩৬. হালালকে হারাম করো না (মায়েদা-৮৭) - ৪৮
৩৭. মদ (নেশা), জুয়া, স্তম্ভ (মূর্তি) ও লটারী পরিহার কর (মায়েদা-৯০) - ৪৯
৩৮. ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না (মায়েদা-৯৪) - ৫১
৩৯. শিকার করলে কাফফারা আদায় কর (মায়েদা -৯৫) - ৫২
৪০. কুরআন যে বিষয়ে নীরব তা নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করো না (মায়েদা-১০১) - ৫৩
৪১. নিজেরা সঠিক পথে থাক (মায়েদা-১০৫) - ৫৩
৪২. অসিয়তের দুইজন স্বাক্ষী রাখ (মায়েদা-১০৬) - ৫৫
৪৩. যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না (আনফাল-১৫) - ৫৫
৪৪. আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) আদেশ অমান্য করো না (আনফাল-২০) - ৫৭
৪৫. আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) এর ডাকে সাড়া দাও (আনফাল-২৪) -
৪৬. আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাস ভংগ করো না (আনফাল-২৭) - ৫৮
৪৭. আল্লাহকে ভয় করার প্রতিদান (আনফাল-২৭) - ৫৮
৪৮. শত্রু বাহিনীর মুকাবিলায় দৃঢ় থাক ও
আল্লাহকে স্মরণ কর (আনফাল-৪৫) - ৫৯
৪৯. কাফের পিতা ও ভাইকেও অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না (তাওবা-২৩) - ৬২
৫০. মুশরিকদের মসজিদুল হারামের নিকটেও প্রবেশ নিষেধ (তওবা-২৮) - ৬২
৫১. ভন্ড আলেমদের থেকে সতর্ক থাক মাল সম্পদের যাকাত দাও (তওবা-৩৪) - ৬৩
৫২. আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যেও না (তওবা-৩৮) - ৬৪

www.nagorikpathagar.org

৫৩. সত্যনিষ্ঠদের সংগী হও (তওবা-১১৯) - ৬৫
৫৪. নিকটতম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর (তওবা -১২৩) - ৬৫
৫৫. রুকু, সিজদা, ইবাদাত ও সৎকর্ম কর (হজ্জ-৭৭) - ৬৭
৫৬. শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (নূর-২১) - ৬৮
৫৭. বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না (নূর-২৭) - ৬৮
৫৮. মুহাররম আত্মীয়-স্বজন এবং চাকর চাকরাণীও
তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করা কর্তব্য (নূর-৫৮) - ৬৯
৫৯. আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে ওজর পেশ করো না (আনকাবুত-৫৬) - ৭২
৬০. আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর (আহযাব-৯) - ৭৩
৬১. আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর (আহযাব-৪১) - ৭৪
৬২. স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেয়া হলে ইদ্দত পালন করতে হবে না
সম্পদ দিয়ে পালন উত্তমভাবে বিদায় কর (আহযাব-৪৯) - ৭৫
৬৩. সামাজিক শিষ্টাচার ও পর্দার আদেশ মেনে চল (আহযাব-৫৩) - ৭৮
৬৪. নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ কর (আহযাব-৫৬) - ৮০
৬৫. নবী রাসূলদের (সাঃ) মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার মত কথা বলো না (আহযাব-৬৯) -
৬৬. সঠিক কথা বল (আহযাব-৭০) - ৮৪
৬৭. সৎ আচরণ গ্রহণ কর, ধৈর্যশীলরা বে-হিসাব পুরস্কার পাবে(জুমার-১০) - ৮৫
৬৮. আল্লাহর সাহায্যকারী হও আল্লাহ তোমাদেরকে
সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন (মুহাম্মদ -৭) - ৮৬
৬৯. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর (মুহাম্মদ-৩৩) - ৮৭
৭০. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর অগ্রে যেয়োনা।
(অতিক্রম করো না) (হুজুরাত-১) - ৮৮
৭১. রাসূল (সাঃ) এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখ (হুজুরাত-২) - ৯০
৭২. ফাসিক লোকদের কথাবার্তার সত্যতা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নাও (হুজুরাত-৬) - ৯১
৭৩. একে অপরকে উপহাস করো না। মন্দ নামে ডেকো না (হুজুরাত-১১) - ৯২
৭৪. বেশী কুধারণা পোষণ করো না, গীবত করো না (হুজুরাত-১২) - ৯৪
৭৫. আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের প্রতি আন্তরিকভাবে
ঈমান আন। নূর পাবে (হাদীদ -২৮) - ১০০
৭৬. পাপাচার ও সীমা লংঘনের ব্যাপারে কানাকানি করো না,
সৎকাজ কর (মুজাদালা-৯) - ১০২

www.nagorikpathagar.org

৭৭. প্রয়োজনে মজলিশের স্থান প্রশস্ত করে দাও (মুজাদালা-১১) - ১০৩
৭৮. ১ াদকা প্রদান পবিত্র হওয়ার উপায় (মুজাদালা-১২) - ১০৫
৭৯. আ 'গামীকালের জন্য কি প্রেরণ করছ তা চিন্তা কর (হাশর-১৮) - ১০৬
৮০. কুফ রি শক্তির অনুকূল কাজ করো না (মুমতাহিনা-১) - ১০৮
৮১. মাহা জির মহিলাদের মুমিনা হওয়ার বিষয়টি যাচাই করে ব্যবস্থা নাও,
মুসলিম ও কাফির পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থেকো না (মুমতাহিনা-১৩) - ১১০
৮২. গজব প্র 'প্তদের সাথে বন্ধুত্ব করো না (মুমতাহিনা-১৩) - ১১৩
৮৩. কথা ও ক াজে গরমিল করো না (সফ-২) - ১১৪
৮৪. যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে মুক্তির পথ (জিহাদ) অবলম্বন কর (সফ-১০) - ১১৫
৮৫. আল্লাহর সাহ ায্যকারী হও, বিজয় তোমাদের (সফ-১৪) - ১১৬
৮৬. জুমআর আযান ের সাথে সাথে বেচাকেনা (কাজকর্ম) বন্ধ কর (জুমআ-৯) - ১১৭
৮৭. ধন-সম্পদ ও সন্ তান-সন্তুতি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে
গাফিল না করে (মু নাফিকুন-৯) - ১২১
৮৮. স্ত্রী ও সন্তান সন্তুতির ব্যাপারে সতর্ক থাক (তাগাবুন-১৪) - ১২২
৮৯. সন্তান-সন্তুতি ও পরিবা র পরিজনকে জাহান্নামের
আগুন থেকে রক্ষা কর (ত াহরিম-৬) - ১২৪
৯০. আল্লাহর কাছে তওবা কর, আ ন্তরিক তওবা (ত াহরীম-৮) - ১২৫

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا، وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.١٠٤

হে মুমিনগণ। 'রায়িনা' (দ্ব্যর্থবোধক শব্দ) বলোনা। 'উনযুরনা' (সম্মান জনক শব্দ) বল এবং শুনতে থাক। নিশ্চয়ই কাফেরদের জন্য রয়েছে বেদনা দায়ক শাস্তি। সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত -১০৪

☆ আলোচ্য আয়াতে রাসূল করীম (সঃ) এর মজলিশে ইসলাম বিরোধী তথা ইহুদী ও মুনাফিকদের স্বরূপ উম্মোচন করা হয়েছে এবং মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। ইহুদী ও মুনাফিকরা সর্বাত্মক চেষ্টা করত রাসূল কারীম (সঃ) -এর মর্যাদাহানী করার এবং কখনো কখনো একাজে স্থুল পদ্ধতি অবলম্বনেও দ্বিধা করতনা। কখনো কখনো তারা উচ্চস্বরে একটি শব্দ উচ্চারণ করত আবার সাথে সাথে নিম্নস্বরে অন্য শব্দ উচ্চারণ করত। এতে তারা নিজেদের মনের হিংসা-বিদ্বেষ ও আক্রোশ চরিতার্থ করত। আর কখনো কখনো তারা এমন শব্দ ব্যবহার করত যার বহুবিধ ব্যবহার থাকে বিশেষতঃ যাকে অসম্মানজনক অর্থেও ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের একটি শব্দ হচ্ছে 'রায়িনা' যার বাহ্যিক অর্থ আমাদের দিকে মনোযোগ দিন, আমাদের কথা শুনুন। কিন্তু অন্য অর্থ আমাদের রাখাল। ইহুদী ও মুনাফিকরা এই শব্দটি রাসূল করীম (সঃ) এর বক্তব্যে বিঘ্ন ঘটানোর জন্য এবং তাকে হেয় করার জন্য বক্তব্যের মাঝপথে এই শব্দটি বলত। তাই আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটির প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে তার পরিবর্তে একটি সম্মানজনক শব্দ 'উনযুরনা' যার অর্থ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে মনোযোগ সহকারে শুনতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন বক্তব্যের মাঝে একথাও বলতে না হয়। অতএব আমরা এই আয়াতে এটাই শিক্ষা পাইযে আমরা এমন শব্দ প্রয়োগে বিরত থাকতে হবে যাকে শত্রুরা অন্য কোন খারাপ অর্থ করতে পারে এবং আমাদের উচিত মনোযোগ সহকারে দায়িত্বশীলদের/শিক্ষকদের কথা শুনা, কথার মাঝখানে এমন কোন কথা না বলা যাতে মন অন্য কোন দিকে ঘুরে যেতে পারে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ، اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

যে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত - ১৫৩

☆ কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সবর এর তিনটি শাখা রয়েছে। (১) নফসকে হারাম ও না-জায়েয কাজ থেকে বিরত রাখা। (২) এবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা ও (৩) কোন বিপদ ও সংকটে অস্থির না হওয়া। মূলতঃ সবর হচ্ছে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণাবলীর সামগ্রিক রূপ এবং ইহাই সাফল্যের চাবি-কাঠি।

প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার এবাদতই সবরের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, নামাজ এমনই একটা এবাদত যাতে ব্যক্তিগত ও

www.nagorikpathagar.org

সমষ্টিগতভাবে ধৈর্য্যের পরিপূর্ণ নমুনা পরিদৃষ্ট হয় এবং তার নিয়মিত অনুশীলন হয়। এখানে একথারও ইংগিত দেয়া হয়েছে যে সফরকারী ও নামাজীদের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। বান্দাহ আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়ার চাইতে বড় পাওনা আর কি হতে পারে? তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায় এবং তার আক্রমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারো থাকেনা। অতএব আমাদের উচিত সব সময় এবং সকল অবস্থায় ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হে মুমিনগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুসামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসেবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর। সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত-১৭২

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

☆ আলোচ্য আয়াতে- সমাজের প্রচলিত রসম রেওয়াজের দিকে না তাকিয়ে যেসব আল্লাহপাক হালাল করেছেন সেসব বস্তু সামগ্রী আহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং আল্লাহ যে এগুলো হালাল করেছেন সেজন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সাথে সাথে এখানে এ ইংগিতও পাওয়া যায় যে ইবাদাত কবুলের জন্য হালাল খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। একটি হাদীসে রাসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ বহুলোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকে ইয়া রব! ইয়া রব! কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ হারাম অর্থে সংগৃহীত এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে।? (মুসলিম, তিরমিযী)। অতএব আমাদের খাদ্য ও উপার্জন অবশ্যই হালাল হওয়া প্রয়োজন এবং সর্বদা আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য নরহত্যার ব্যাপারে কিসাস এর আইন লিখে দেয়া হয়েছে। মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি হত্যাকারী হলে তাকে হত্যা করেই কিসাস নেয়া হবে। ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে তাকে হত্যা করেই কিসাস নেয়া হবে। কোন নারী হত্যাকারীনি হলে তাকে হত্যা করেই কিসাস নেয়া হবে। অবশ্য কোন অপরাধীর প্রতি তার ভাই যদি কিছুটা নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয় তবে প্রচলিত ন্যায় নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য।

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى،
اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى، فَمَنْ عُفِىَ لَه
مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ
وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ، ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ

www.nagorikpathagar.org

مِنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. ١٧٨

ইহা তোমাদের রবের নিকট হতে দন্ডহ্রাস ও অনুগ্রহ মাত্র। তারপরেও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তারজন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত-১৭৮

☆ কিসাসুন -এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ অর্থাৎ অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা তার পক্ষে জায়েয। অর্থাৎ রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহণে হত্যাকারীর সাথে যেরূপ ব্যবহার করা হয়েছে সেরূপ সে নিহত ব্যক্তির সাথে করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যেভাবে ও যে পন্থায় নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে ঠিক সেভাবে ও সে পন্থায় তাকে হত্যা করতে হবে। বরং এর অর্থ এই যে নিহত ব্যক্তির প্রাণ সংহারের যে কাজ হত্যাকারী করেছে তার সাথেও সেই কাজটি করতে হবে অর্থাৎ তাকে হত্যা করতে হবে।

জাহিলিয়াতের যুগে একজাতি বা গোত্রের লোকেরা তাদের নিহত ব্যক্তির প্রাণকে যতবেশী মূল্যবান মনে করত হত্যাকারী ব্যক্তির পরিবার গোত্র বা জাতির মধ্য হতে অনুরূপ মূল্যের কোন ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে প্রতিশোধ নিতে চাইত। একপক্ষের কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি প্রতিপক্ষের কোন নগণ্য ব্যক্তি কর্তৃক নিহত হত তবে প্রথম পক্ষের লোকেরা শুধু হত্যাকারীর প্রাণ সংহারকেই যথেষ্ট মনে করতনা। বরং তারা হত্যাকারীর পরিবার হতে অনুরূপ কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে হত্য করতে চাইত কিংবা এক ব্যক্তির বিনিময়ে প্রতিপক্ষের শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাইত। পক্ষান্তরে নিহত ব্যক্তি যদি তাদের দৃষ্টিতে নিম্নশ্রেণীর হত এবং তার হত্যাকারী খুব সম্মানিত হত তবে নিহত ব্যক্তির প্রাণের বিনিময়ে এই সম্মানিত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করা তারা সমীচিন মনে করতনা। এরূপ অবস্থা শুধু তৎকালীন জাহিলী যুগে সীমাবদ্ধ ছিলনা। নিকট অতীত এমনকি সমকালীন বিশ্ব এবং আমাদের সমাজেও এধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্পাক এসব অন্যায় ও অমানুষিক রীতিনীতি ও দোষক্রুটির পথ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন নিহত ব্যক্তির হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারীর এবং শুধু হত্যাকারীরই প্রাণ সংহার করা যেতে পারে। হত্যাকারী কে বা নিহত ব্যক্তি কে এব্যাপারে তা আদৌ কোন বিবেচ্য বিষয় নয়।

পরবর্তীতে এই আয়াতে ভাই শব্দের উল্লেখ দ্বারা অত্যন্ত, সুক্ষ্ম পন্থায় উদারতা প্রদর্শনের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার ও অপর ব্যক্তির মধ্যে পিতৃহত্যার শক্রতা থাকলেও সে ব্যক্তিতো তোমার মানবীয় ভাই। কাজেই তোমারই এক অপরাধী ভায়ের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ক্রোধ যদি দমন কর তবে মানবতার দিক দিয়ে ইহা যথোচিত কাজ হবে। এই আয়াত হতে এটাও জানা গেল যে ইসলামী দন্ডবিধিতে নরহত্যার দন্ড পর্যন্ত উভয়পক্ষের মর্জীর উপর নির্ভরশীল। এবং হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার

www.nagorikpathagar.org

অধিকার নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর রয়েছে। অবশ্য আয়াতের নির্দেশনানুযায়ী হত্যাকারীকে ক্ষমা করা হলেও দন্ডের বিনিময়ে রক্তমূল্য বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে। অতঃপর বলা হয়েছে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রক্ত বিনিময় গ্রহণ করার পরও যদি প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে কিংবা হত্যাকারী বিনিময় প্রদানে টালবাহানা করে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর নম্র ব্যবহারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন না করে তবে তাহা বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন হবে। এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.١٨٣

হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত - ১৮৩

☆ সাওম-এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা শরিয়তের পরিভাষায় পানাহার এবং স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম'। তবে সুবহে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এভাবে বিরত থাকলেই তা রোজা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের সামান্য আগেও যদি কেউ কিছু পান করে অথবা খেয়ে ফেলে অথবা স্ত্রীসহবাস করে তাহলে রোযা হবেনা। আবার সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে তাহলেও রোযা হবেনা। এই আয়াত থেকে আমরা একমাত্র জানতে পারলাম যে রোযা আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরজ ছিল। যদিও আমরা তাদেরকে হুবহু আমাদের মত রোযা রাখতে দেখিনা তবুও ইহুদী, খ্রীষ্টান এমনকি হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যেও কোন না কোন প্রকারে উপবাস তথা রোযা রাখার বিধান দেখি। মূলত রোযার বিধানও তাদের মধ্যে অন্যান্য বিধানের মত বিকৃত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে রোযা রাখা ফরজ হওয়ার ঘোষণার সাথে সাথে এর উদ্দেশ্যও বর্ণনা করা হয়েছে-তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়ার অর্থ হল আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর বিধি নিষেধগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতি মূহুর্তে মেনে চলা। মূলত রোযা এই মেনে চলার ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী ট্রেনিং দিয়ে থাকে। অন্যান্য এবাদত করার সময় প্রায় সব সময়ই অন্য কেউনা কেউ দেখতে পায় অথবা সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু রোযার এই দীর্ঘ সময়ে যদি কেউ কিছু খেয়ে নেয় অথবা পান করে তাহলে সে করতে পারে এক্ষেত্রে অন্য কারো দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু কোন রোযাদার এটা করেনা কারণ সে মনে করে অন্য কেউ না দেখলেও আল্লাহতো দেখতে পাচ্ছেন। এই যে আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন

www.nagorikpathagar.org

প্রতি মূহুর্তের এই মনোভাব এবং দীর্ঘ পূর্ণ দিনের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় করে নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত থাকা। - এটাই তাকওয়া এবং রোজার চেয়ে অন্য কোন মাধ্যমে এই তাকওয়া বেশী অর্জিত হতে পারেনা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوتِ الشَّيْطنِ، اِنَّه لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. ٢٠٨

হে মুমিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শুক্র।

সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত-২০৮

☆ আলোচ্য আয়াতটি কুরআন শরীফের সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত আয়াত। বর্তমানে আমাদের সমাজের নিম্নপর্যায়ের সাধারণ একজন মুসলমান থেকে নিয়ে মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষিতরা পর্যন্ত, মসজিদের ইমাম থেকে নিয়ে মসজিদ কমিটির লোক বা শুধু জুমআর মুসল্লি অথবা পাঞ্জেগানা মুসল্লি আর আমরা যাদেরকে সমাজের ধর্মীয় নেতা মনে করি অথবা রাজনৈতিক নেতা মনে করি সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া সকলের জন্য এ আয়াতটি একটি বজ্র হুংকার, কঠোর সতর্কবাণী-যারা ইসলামের শুধুমাত্র একটি বা দু'টি অর্থাৎ খন্ডিত অংশ নিয়েই চলাকে যথেষ্ট মনে করছেন। অথচ আল্লাহ্পাক এই আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন যে তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। পূর্ণাংগ ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে টাল-বাহানা, গড়িমসি করতে থাকলে। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণীত পূর্ণাংগ জীবন বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম এবং ইসলাম একটি পূর্ণাংগ জীবন বিধান। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও এবাদাতের সাথেই হোক কিংবা আচার অনুষ্ঠান, সামাজিকতা ও রাষ্ট্রের সাথে হোক, অথবা রাজনীতির সাথে হোক এর সম্পর্ক ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে হোক কিংবা শিল্পের সাথে হোক, ব্যাংকিং বা অর্থনীতি যাই হোক না কেন ইসলাম যে পূর্ণাংগ ব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অনুসরণ কর। তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এই আয়াত কিছুতেই ইসলামকে মসজিদ, মক্তবে কিছু এবাদাত বন্দেগীর মাঝে সীমাবদ্ধ করতে দেয়না। বরং ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আচার ব্যবহার, লেনদেন, কাজ কারবার সবকিছুতেই ইসলামের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

আমরা জীবনের যে ক্ষেত্রেই ইসলামের সীমারেখার বাইরে পদার্পন করব সেক্ষেত্রেই সেটা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ ছাড়া আর কিছু হবে না। তাই শুধু পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশ দিয়েই আয়াতটি শেষ করা হয়নি সাথে এটাও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা যাবেনা। আরো সতর্ক করে দেয়া

হয়েছে যে শয়তান আমাদের শত্রু। অতএব আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি মূহুর্তে ইসলামের সীমার প্রতি লক্ষ্য রেখে, পূর্ণাঙ্গ ভাবে ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে। এবং কিছুতেই যেন শয়তানের চক্রান্তে আমরা জড়িয়ে না পড়ি সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ. وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.٢٥٤

হে মুমিনগণ! যা কিছু রিযিক(অর্থসম্পদ)আমি তোমাদিগকে দান করেছি তা থেকে ব্যয় কর, সেই দিনটি উপস্থিত হওয়ার পূর্বে যেদিন - না ক্রয় বিক্রয় হবে, না বন্ধুত্ব কোন কাজে আসবে, আর না চলবে কোন সুপারিশ।

প্রকৃত জালিমতো তারাই যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে। সূরা (২) বাকারা আয়াত - ২৫৪

☆ আলোচ্য আয়াতে আমাদের রিজিক থেকে ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের ধন-মাল, টাকা-পয়সা, সোনা-গয়না, যায়গা জমি এগুলোই শুধু রিজিক এর অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং আমাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তি সামর্থও রিজিক এর অন্তর্ভূক্ত। এগুলো সবই ব্যয় করতে হবে মৃত্যু আসার আগেই আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে। আর আল্লাহর পথে ব্যয় করা বলতে ব্যক্তি, সমাজ, আত্মীয়, অনাত্মীয় ইত্যাদি সকলের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা বুঝায়। সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, বিচার দিনে কারো বন্ধুত্বের মাধ্যমে, অথবা সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা যাবেনা। অথবা এমন যা কিছু সহায় সম্পদ আছে সবকিছু দিয়েও মুক্তি ক্রয় করার উপায় থাকবেনা। অতএব যারা এমনই পরকালীন মুক্তির জন্য কাজ করবেনা অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবেনা তাদের নীতি হল কুফরী নীতি। কুফরী নীতি অবলম্বনকারী তারা, যারা আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে অস্বীকার করে। এবং নিজেদের ধনসম্পদকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেয়েও অধিকতর প্রিয় মনে করে। অথবা যে বিচার দিনের ভয় দেখানো হয়েছে সেই বিচারদিনের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই কিংবা যারা এই অমূলক ধারণা পোষণ করে যে, পরকালে কোন না কোন রূপে মুক্তি ক্রয় করে নেয়া এবং বন্ধুত্ব ও সুপারিশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিরাট সুযোগ লাভ করা যাবে- তাদের কথা বুঝানো হয়েছে। অতএব আমাদেরকে পরকালীন অনন্ত জীবনের জন্য এমনই এই সীমিত ও ক্ষুদ্র ক্ষনস্থায়ী জীবনেই যথাশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে। আল্লাহর পথে আমাদের রিজিক ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে অন্যকিছুকে অগ্রাধিকার দেয়া যাবেনা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى، كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

হে মুমিনগণ ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাত বরবাদ করোনা, সে ব্যক্তির মত যে নিজের

www.nagorikpathagar.org

الْاٰخِرِ. فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا، لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا، وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ. ٢٦٤

ধনসম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা। অতএব এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি পাথরের চাতালের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। যখন এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হল তখন সমস্ত মাটি ধুয়ে বয়ে গেল এবং গোটা চাতালটি পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায়না যা তারা ব্যয় করেছে। আল্লাহ্ কাফেরদের পথ প্রদর্শন করেননা। সূরা(২) বাকারা ঃ আয়াত-২৬৪

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে লোক দেখানো দান খয়রাত এবং দান খয়রাত করে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। বলা হয়েছে এ ধরনের কাজ কুফরীর নামান্তর। কেবল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করার সুস্পষ্ট অর্থ এই যে মানুষকেই সে মাবুদের মত মনে করে। ফলে তাদের নিকটই প্রতিফল পেতে চায়। আল্লাহর নিকট না সে কাজের প্রতিফল চায় আর না সে বিশ্বাস করে যে হিসেবের একটি দিন আসবে যেদিন প্রতিটি কাজের প্রতিফল দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত বৃষ্টি অর্থ দান খয়রাত, পাথুরে চাতাল অর্থ খারাপ নিয়ত, মাটির হালকা স্তর অর্থ পূণ্যের বাহ্যিক রূপ যার নীচে খারাপ নিয়ত লুকিয়ে রয়েছে। এই বিশ্লেষণের ফলে উদাহরণটি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারা যায়। বৃষ্টিপাত হলে চতুর্দিকে শস্যশ্যামল হয়ে উঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে মাটি শস্যশ্যামল হবে তাহাই যদি নামমাত্র বর্তমান থাকে, যদি একান্তই অগভীর হয় এবং সেই অগভীর মাটির আস্তরের নিচে কঠিন পাথরের চাতাল বর্তমান থাকে তবে বৃষ্টিপাত এই মাটির জন্য উপকারী না হয়ে বরং অপকারী হবে। অনুরূপভাবে দান খয়রাত যদিও মানুষের মধ্যে মংগলের ভাবধারা বিকাশ ও উন্নতি বিধানের জন্য যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে কিন্তু উহার উপকারী হওয়ার জন্য প্রকৃত নেক নিয়াত, ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা একান্তই আবশ্যক।

পরিশেষে 'কাফির' শব্দটি দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া সম্পদকে আল্লাহর পথে আল্লাহর সন্তোষ লাভের নিয়তে খরচ করেনা বরং তার পরিবর্তে মানুষের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করে কিংবা আল্লাহর পথে কিছু সম্পদ ব্যয় করলেও সে সংগে গ্রহীতাদের লাঞ্ছনা বা জ্বালা-যন্ত্রণা দেয় তাকে বুঝানো হয়েছে। আর সে যখন নিজেই আল্লাহর সন্তোষ লাভে অনিচ্ছুক তখন আল্লাহও তার মুখাপেক্ষী নন। তাই তিনি তাকে নিজের সন্তোষের পথ প্রদর্শন করবেন না।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْامِنْ طَيِّبٰتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآاَخْرَجْنَالَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ، وَلَاتَيَمَّمُوْاالْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآاَنْ تُغْمِضُوْافِيْهِ، وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ. ٢٦٧

হে মুমিনগণ! তোমরা যে সম্পদ (হালাল ভাবে) উপার্জন করেছ এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর। এবং তা থেকে নিকৃষ্ট অংশ ব্যয় করতে মনস্থ্ করোনা। কেননা সেই জিনিষই যদি কেহ তোমাদের দেয় তবে তোমরা গ্রহণ করবে না যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও। মনে রেখ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন এবং তিনি উত্তম গুণে বিভূষিত। সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত-২৬৭

☆ আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি ইসলামে দানের মূল্য আছে যদি (১) দানের বস্তু ভালো এবং মূল্যবান হয়। যেটা ব্যবহারের অযোগ্য বরং যেটাতে ব্যবহার করতে গেলে ক্ষতি হবে সেটা দান করা সওয়াব নয় বরং গুণাহ। (১) দানের বস্তু হালালভাবে অর্জন করতে হবে। চুরি, ডাকাতি করে অথবা অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ দান করলে সওয়াবের পরিবর্তে গুণাহ হবে। জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের খারাপগুলো বেছে বেছে দান করা উচিত নয়। কেননা আমরা জেনে শুনে কেহ পারতপক্ষে সেটা নিজের জন্য গ্রহণ করতে রাজী নই। তবে কারো কারো যদি উত্তম ফসল একেবারেই না থাকে তবে যা আছে তা থেকেই দান করতে হবে এবং ফসলের যাকাত আদায় করতে হবে। (৪) আল্লাহর দান তথা কোন বিশেষ গুণাবলী শিল্প বিদ্যা ইত্যাদি যেগুলো কল্যাণকর সেটা অপরকে শিক্ষা দেওয়া সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে সেগুলো যদি ক্ষতিকর বিদ্যা হয় তবে তা সওয়াবের পরিবর্তে গুণাহই হবে।

পরিশেষে আল্লাহ সতর্ক করে দিচ্ছেন যে আল্লাহ সকল উত্তম গুণাবলীর অধিকারী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন। অতএব আমরা দান করার সময় অবশ্যই উত্তমটিই দান করার চেষ্টা করব।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوااتَّقُوااللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِيَ مِنَ الرِّبٰوااِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. ٢٧٨

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যেসমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি বাস্তবিকই মুমিন হয়ে থাক। সূরা (২) বাকারা, আয়াত ২৭৮

☆ আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে সুদকে চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এবং কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সুদের ভিত্তিতে কোন কিছু

www.nagorikpathagar.org

বিনিয়োগ করা হলে সুদ পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র মূলধন নেয়ার জন্য। এবং এরপরও যদি কেহ সুদের ভিত্তিতে কোন বিনিয়োগ করে তবে তাহার ঈমান নেই। পরবর্তী আয়াতে আরো কঠোরভাবে সুদের ভিত্তিতে লেনদেনকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। অতএব অত্র আয়াতদ্বয় থেকে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য অথবা কোন প্রকার লেনদেন সুদের ভিত্তিতে করতে পারিনা। অন্যথায় আমরা মুমিন না হয়ে কাফের বলে পরিগণিত হব।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ،
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ م بِالْعَدْلِ،
وَلَايَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَيْهُ
اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَّمَهُ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَايَبْخَسْ
مِنْهُ شَيْئًا، فَاِنْ كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْضَعِيْفًا
اَوْلَايَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَفَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوْا
شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ، فَاِنْ لَّمْ
يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ
تَضِلَّ اِحْدٰ هُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰ هُمَا
الْاُخْرٰى، وَلَايَاْبَ الشُّهَدَاۤءُ
اِذَامَادُعُوْا، وَلَاتَسْئَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ
صَغِيْرًا اَوْكَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ، ذٰلِكُمْ

হে মুমিনগণ! যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তোমরা ঋণের লেনদেন কর তবে তা লিখে রাখ। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সংগতভাবে তা লিখে দেবে। আল্লাহ যাকে লিখা পড়ার যোগ্যতা দান করেছেন তার লিখতে অস্বীকার করা উচিত নয় বরং সে লিখবে। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লিখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন (লিখক) স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে। এবং লিখার মধ্যে বিন্দুমাত্র বেশকম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা সে যদি লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে তার অভিভাবক ন্যায়সংগতভাবে লিখাবে। অতঃপর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুইজনকে সাক্ষী কর। যদি দুজন পুরুষ পাওয়া না যায় তবে ১ জন পুরুষ ও দুজন মহিলাকে স্বাক্ষী কর যেন একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাক্ষ্য এমন লোকদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত যাদের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষ্য দিতে বলা হবে তখন অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক কিংবা বড় হোক সময় নির্দিষ্ট করে উহা

www.nagorikpathagar.org

أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوْا إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا، وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ، وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ، وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ. ٢٨٢

লিখে নেয়াকে উপেক্ষা করোনা। আল্লাহর নিকট এই পন্থা তোমাদের জন্য অধিকতর সুবিচার মূলক। এবং ইহার দরুন সাক্ষ্য কায়েম করা খুবই সহজ হয় এবং তোমাদের সন্দেহ সংশয়ে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য যেসব ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন তোমরা হাতে হাতে করে থাক তা লিখে না নিলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনো কষ্ট দেয়া না হয়। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে সঠিক কর্মনীতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনি সবকিছু জানেন। সূরা (২) বাকারা ঃ আয়াত-২৮২

☆ সাধারণত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ঋণদান বা ঋণগ্রহণের ব্যাপারে লিখিত হওয়া বা সাক্ষ্য রাখাকে দোষের কাজ বা আস্থাহীনতার প্রমাণ মনে করা হয়। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ এই ঋণ ও ব্যবসায় সংক্রান্ত শর্তাবলী লিখে রাখতে হবে যেন লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদান প্রদান খুবই নির্দোষ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। ধার কর্জের লেনদেন দলিল লিখে রাখলে ভুল-ভ্রান্তি হলে অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকার করার পরিস্থিতি উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে। ধার কর্জের ব্যাপারে অবশ্যই মেয়াদ নির্ধারিত হওয়া উচিত। অনির্ধারিত ধার কর্জের লেনদেন জায়েজ নয়। তাতে কলহ বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। লিখক নিরপেক্ষ হওয়া উচিত যাতে কারো মনে সন্দেহ বা খটকা না থাকে। লেখককে ন্যায়সংগতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন এক জনের ক্ষতি অপরজনের লাভ করতে গিয়ে নিজের পরকাল বরবাদ না হয়। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে দলীলের শর্তসমূহ যে ঋণ গ্রহীতা সে-ই বলে দেবে ফলে এটা হবে তারপক্ষে থেকে স্বীকৃতি এবং অংগীকার পত্র। আর যদি দেনাদার নির্বোধ বা অক্ষম হয় যার কারণে তারপক্ষে বিষয়বস্তু বলা সম্ভব না হয় তাহলে তার কোন অভিভাবক বিষয়বস্তু বলে দেবে। এরপর বলা হচ্ছে যে লিখার পরও সাক্ষী রাখতে হবে। যাতে কখনো কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। সাক্ষীর সংখ্যাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে- ২ জন পুরুষ অথবা ১ জন পুরুষ ও

www.nagorikpathagar.org

২ জন মহিলা হতে হবে। এবং সাক্ষীকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে। যারা গ্রহণ যোগ্য অর্থাৎ সাক্ষী যেন কোন ফাসেক বা পাপাচারী, মিথ্যাবাদী না হয়। অতঃপর এটাও বলা হচ্ছে যে কাউকে স্বাক্ষী থাকার জন্য আহ্বান করা হলে তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। অতঃপর এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে যে, কোন পক্ষ যেন লিখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্থ অথবা বিব্রত না করে যার কারণে লোকজন সাক্ষ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। এখনো সর্বোত্তম পন্থায় অথচ বাস্তবসম্মতভাবে অর্থনৈতিক লেনদেনের কথা বলা হয়েছে। বিষয় বস্তু ঠিক করে সাক্ষী রেখে কাজ কর্ম করতে হবে। যাতে সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ না থাকে। এখানে সততা একটি কর্মপন্থাই শুধু নয় বরং ধর্মীয় দায়িত্ব এমনভাবে করতে হবে যেন আমরা আল্লাহর সম্মুখেই কাজ করছি।

এ আয়াতে আমাদেরকে লেনদেনের যে উন্নত ও সুন্দর, সুশৃঙ্খল পন্থা শিক্ষা দেয়া হয়েছে আমাদের উচিত অবশ্যই একে যথাযথভাবে অনুসরণ করা যাতে আমাদের সামাজিক জীবন মিল মহব্বত পূর্ণ হয় এবং সুন্দরভাবে গড়ে উঠে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. ١٠٢

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং তোমাদের কারো যেন মৃত্যু না হয় সেই অবস্থা ছাড়া যখন তোমরা হবে মুসলিম। সূরা (৩) আল ইমরান ঃ আয়াত-১০২

☆ ভয় অনেক প্রকার হতে পারে যেমন- (১) কাপুরুষের ভয়। (২) কোন কিছু না জানার ভয় (৩) নিজের বা নিজের পছন্দের জনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য ভয় ও (৪) কাহাকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা করার জন্য যে ভয়।

আলোচ্য আয়াতে তাকওয়া শব্দের অর্থে যে ভয় ব্যবহার করা হয়েছে সেটা মূলত তৃতীয় ও চতুর্থ অর্থেই ভয়। অর্থাৎ আল্লাহর রোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করার ভয় এবং আল্লাহর ভালাবাসা রক্ষা করা ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়।

'হাক্কা তুকাতিহি' অর্থাৎ তাকওয়ার হক কি? এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীত কোন কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ করা, কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কখনো অকৃতজ্ঞ না হওয়া। (বাহরে মুহীত) পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে মুসলিম অবস্থা ছাড়া মৃত্যু না হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ ইসলামই প্রকৃত তাকওয়ার নাম। এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতি মূহুর্ত আমাদেরকে ইসলামের উপর, তাকওয়ার উপর অবিচল থাকতে হবে। কারণ, কখন কোন মূহুর্তে কার মৃত্যু হবে এটা আমরা কেউ জানিনা। অতএব ঈমানের দাবীই হচ্ছে প্রতিমূহুর্তে ইসলামের উপর অবিচল থেকে তাকওয়ার উপর অবিচল থেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَايَاْلُوْنَكُمْ خَبَالاً، وَدُّوْا مَاعَنِتُّمْ، قَدْبَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ، وَمَاتُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ، قَدْبَيَّنَّا لَكُمُ الاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ١١٨

হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের অমংগল সাধনে কোন ত্রুটি করেনা। তোমরা কষ্ট পেলেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফসকে বেরোয় আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো যদি তোমরা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। সূরা (৩) আল ইমরান ঃ আয়াত-১১৮

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদী অথবা মুনাফিক যে-ই হোকনা কেন তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবেনা। আল্ কোরআন বলছে তারা কখনই তোমাদের সত্যিকার হিতাকাংখী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদেরকে বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপৃত এবং পার্থিব ও ধর্মীয় অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোনভাবে তোমাদের ক্ষতিহোক এটাই হল তাদের একমাত্র কাম্য। তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে আছে তা অত্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্দমনীয় জিঘাংসায় উত্তেজিত হয়ে এমনসব কথাবার্তা বলে ফেলে যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুদের অন্তরংগ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন অতএব মুসলমানদের এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

ইবনে আবী হাতেম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে বলা হলো এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে আপনি তাকে ব্যক্তিগত সেক্রেটারী (মুনশী) হিসেবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) উত্তরে বললেন "এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করা হবে। যা আল্ কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থী।"

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে ইসলাম স্বীয় বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয় বরং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন "যে ব্যক্তি কোন জিম্মি অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয় কিয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হব, আর আমি যে মুকাদ্দমায় বাদী হব তাতে জয়লাভ অবধারিত।"

কিন্তু এতদসত্বেও মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্টপূর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষনের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেয়ার অনুমতি মুসলামানদের দেয়া যায়না। কারণ এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। অতএব আমরা বন্ধুত্ব করার সময় এবং বন্ধু নির্বাচনে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاكُلُوْا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً، وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. ١٣٠

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা। আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার। সূরা (৩) আল ইমরান ঃ আয়াত-১৩০

☆ আলোচ্য আয়াতে কয়েকগুণ বেশী তথা চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি বরং সুদের একটি প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এখানে এদিকেও ইংগিত থাকতে পারে যে সুদের উপার্জন যখন পুনরায় সুদে খাটবে তখন প্রকারান্তরে অবশ্যই এটা চক্রবৃদ্ধি আকার ধারণ করে। মূলত সকল প্রকার সুদ গ্রহণই নিষিদ্ধ। সূরা বাকারায় ২৮৭ এবং ২৯৭ নং আয়াতে বজ্রকঠোর কণ্ঠে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এটা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সুদ গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআন আমাদেরকে বারবার দয়াদাক্ষিণ্য নিঃসার্থপরতা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের ভাইদের সাহায্য করার শিক্ষা দেয়, অথচ সুদ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অন্যের দুরাবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে শোষণ করার ঘৃণ্যতম হাতিয়ার। প্রকৃত কল্যাণ লোভে নয় বরং দানেই রয়েছে। অতএব আমাদের উচিত সুদখোরী পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে তাঁরই সৃষ্ট জীবের কল্যাণে নিজেদের সম্পদ বিনিয়োগ করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ. ١٤٩

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি সেসব লোকের ইশারানুযায়ী চলতে শুরু কর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে অতঃপর তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থকাম হবে। সূরা (৩) আল ইমরান, আয়াত-১৪৯।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে তারা যেন কাফেরদের কুপরামর্শে কান না দেয়। কারণ তারাতো চাইবেই যে মুমিনরাও তাদের মত কুফরীর পথ অবলম্বন করুক। আর এটাযে চূড়ান্ত ব্যর্থতা এবং চরম ক্ষতি সেটাতো বলার

www.nagorikpathagar.org

অপেক্ষা রাখেনা। আল ইমরানের ১১৮ নং আয়াতে আরো বিস্তারিত এবং কঠোর ভাষায় মুমিনদেরকে এব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। অতএব আমরা কখনোই কোন কাফেরের পরামর্শে কান দেয়া চলবেনা।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ
اِذَاضَرَبُوْافِى الْاَرْضِ اَوْكَانُوْا غُزًّى
لَّوْكَانُوْاعِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَاقُتِلُوْا،
لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ
قُلُوْبِهِمْ، وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ، وَاللّٰهُ
بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. ١٥٦

হে মুমিনগণ! কাফিরদের মত কথাবার্তা বলোনা। যাদের আত্মীয়স্বজন কখনো সফরে গেলে কিংবা যুদ্ধে শরীক হলে তারা বলে যে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকত তাহলে মারা যেত না, এবং নিহত হতনা। আল্লাহ এধরনের কথাবার্তাকে তাদের মনের দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ বানিয়ে দেন। মৃত্যু ও জীবনদানকারী হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ। এবং তোমাদের সকল কাজকর্মের উপর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে। সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৫৬

☆ আলোচ্য আয়াতে (আল ইমরান ১৫৬) মুমিন ও কাফেরদের চিন্তাধারার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। এবং মুমিনদেরকে কাফেরের মত চিন্তাভাবনা না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বিশ্বাসের অভাবই মানুষকে ভীত করে (১) মৃত্যুর সম্মুখীন হতে ও (২) তাদের কর্তব্য পালন করা যখন বিপজ্জনক হয় যথা আল্লাহর পথে জিহাদ (যুদ্ধ) করতে। যদি কারো বিশ্বাস থাকে তাহলে মৃত্যু বরণ করতে ভয় থাকার কথা নয় কারণ এটা তাকে লক্ষ্যে পৌছিয়ে দেয় এবং সে নির্ভয়ে যে কোন কাজে ঝাপিয়ে পড়তে পারে। সে জানে জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে। যদি আল্লাহ মৃত্যুর সমন পাঠান তাহলে ঘরের ভিতর থাকলে কিংবা অত্যন্ত সুরক্ষিত দুর্গের ভিতর থাকলেও রক্ষা পাওয়া যাবেনা। যদি তাঁর ইচ্ছা এটাই যে তুমি বাঁচবে তাহলে বিপজ্জনক কাজ তোমার গৌরব আরো বাড়িয়ে দেবে। আর যদি তাঁর ইচ্ছা এটাই যে বিপজ্জনক এই কাজে তিনি তোমার জীবন নেবেন তাহলে তিনটা বিষয় বিবেচ্য (ক) নিজের কর্তব্য পালনে মৃত্যু বরণ করা আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়ার সর্বোত্তম উপায় (খ) তার বিশ্বাসের কারণে সে জানে যে সে অজানা কোথাও যাচ্ছেনা বরং তার পরম প্রিয় আল্লাহর নিকটই যাচ্ছে এবং (গ) সেখানে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সাথে সাথে অন্যান্য মুমিন প্রিয়জনদের সাথেও মিলিত হবে। এবং এজন্যই সে সর্বদা আগ্রহী থাকে তার সকল প্রিয়জনদের সাথে মিলিত হওয়ার।

www.nagorikpathagar.org

অতএব আমাদের উচিত কখনো কর্তব্য পালনে পিছপা না হওয়া। একথা চিন্তা না করা যে এখানে গেলে বিপদ হবে, না গেলে নিরাপদ থাকা যাবে। এবং সর্বোপরি আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা নিয়ে কাজে ঝাপিয়ে পড়া।

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْااللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. ٢٠٠

হে মুমিনগণ! ধৈর্য ধারণ কর। এবং দৃঢ়তা অবলম্বন কর। সত্যের খেদমতের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাক। এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার।
সূরা (৩) আল ইমরান, আয়াত-২০০

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে চারটি বিষয়ে নসিহত করা হয়েছে (১) সবর (২) মুসাবারাহ (৩) মুরাবাতাহ ও (৪) তাকওয়া।

(১) **সবর ঃ** শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাঁধা আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর দৃঢ় রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে (ক) সবর 'আরাওয়াত' অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোকনা কেন তাতে মনকে স্থির রাখা। (খ) সবর আনিল মাআসী অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) নিষেধ করেছেন সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোকনা কেন, যত স্বাদেরই হোকনা কেন তা থেকে মনকে বিরত রাখা। (গ) সবর আলা মাসায়ের অর্থাৎ বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা। দুঃখ-কষ্ট, সুখ-শান্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন মস্তিষ্ককে সেজন্য অধৈর্য করে না তোলা।

(২) **মুসাবারাহ ঃ** শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ়তা, অনমনীয়তা অবলম্বন করা। ইহারও দুইটি দিক আছে (ক) কাফিররা কুফরীর জন্য যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করছে একে জয়ী করার জন্য যেরূপ কষ্ট স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করছে তাদের মোকাবেলায় তোমরা তাদের চেয়েও অধিক শৌর্য-বীর্য ও দৃঢ়তা দেখাও (খ) কাফেরদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা প্রদর্শনে তোমরা পরস্পর প্রতিযোগিতা কর।

(৩) **রেবাত বা মুরাবাতা ঃ** ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তের হেফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করার নামই রেবাত বা মুরাবেতা। এরও দুটি রূপ হতে পারে (ক) সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রীম সতর্কতা বা হেফাযত হিসেবে তার দেখাশোনা করতে থাকা। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুযী রোজগার তারই আনুসাঙ্গিক বিষয় হয় তবে এমন ব্যক্তিরও রেবাত ফি সাবিলিল্লাহর সাওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনো যুদ্ধ করতে না-ও হয়

www.nagorikpathagar.org

তবুও। (খ) সীমান্ত যুদ্ধাবস্থায় থাকা। এই উভয় অবস্থায় সীমান্ত রক্ষার অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে হযরত রাসূল করীম (সাঃ) থেকে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন - একদিন ও একরাতের বেরাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত একমাসের রোজা এবং সমগ্ররাত এবাদতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষাকৃত উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে থাকে তবে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। বুখারী শরীফে রয়েছে আল্লাহর পথে একদিনের বেরাত সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম।

সমস্ত মুসলমানদের সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। ফলে এক জন সীমান্তরক্ষীর এই কাজ সমস্ত মুসলমানদের সৎ কাজের কারণ হয়। যে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার রেবাত তথা সীমান্ত প্রহরার সওয়াব অব্যাহত থাকবে।

৪) **তাকওয়া ঃ** অর্থাৎ প্রতিমূহুর্তে আল্লাহকে ভয় করা। সূরা আল ইমরানের ১০২ নং আয়াতে তাকওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাকওয়া সমস্ত কাজের প্রাণশক্তি। সেইরূপ উপরোক্ত তিনটি কাজেরও ফল আমরা তখনই পাব যখন এর সাথে তাকওয়া যুক্ত থাকবে। কুরআনে কল্যাণ বলতে যা বুঝায় সেটা বৃহত্তর পরিসরে বুঝতে হবে। এটা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক দুনিয়াবী কাজকর্ম এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সবকিছুরই সমষ্টি। উভয়ক্ষেত্রেই সুখ মনোবাঞ্ছা পূরণ যেটা আল্লাহর ভালোবাসায় পরিশুদ্ধ সেটাই প্রকৃত কল্যাণ। সেই প্রকৃত কল্যাণ লাভেই আমাদেরকে সবর, মুসাবারাহ, মুরাবাতা ও তাকওয়া অর্জন করতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا. ١٩

হে মুমিনগণ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয়। এবং যা কিছু দান করেছ জ্বালা যন্ত্রনা দিয়ে উহার কিছু অংশ হস্তগত করার চেষ্টা করাও হালাল নয়। কিন্তু প্রকাশ্য চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হলে। তাদের সাথে মিলে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর, তারা যদি তোমাদের মনপুত না হয় তবে হতে পারে যে কোন জিনিষ তোমাদের পছন্দ নয় কিন্তু আল্লাহ উহাতেই তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ রেখেছেন।

সূরা (৪) নিসা ঃ আয়াত-১৯

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে প্রথমত বলা হয়েছে যে, কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যুর পর তার (স্বামীর) পরিবারের লোকজন যেন বিধবা স্ত্রীকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি মনে করে উত্তরাধিকারী হয়ে না বসে। কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায় এবং ইদ্দত পালন করার পর যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যার সাথে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে (মুহাররম ব্যতীত)। প্রাচীন আরবে এ ধরনের কুপ্রথাও ছিল যে স্বামী মারা যাওয়ার পর এমনকি তার সন্তানরাও বিধবাকে (মাকে) বিয়ে করত। এখানে এই কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে, স্ত্রী লোকদের সম্পত্তি জবর দখল করার জন্য অথবা তাদের প্রদেয় মোহরানা মাফ করানোর জন্য যেন জ্বালা যন্ত্রনা দেয়া না হয়। তাদের শুধু তখনই শাস্তি দেয়া যাবে যদি তারা সুস্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এটাও করা যাবে তাদেরকে সংশোধন করার জন্য, তাদের সম্পত্তি লুটেপুটে খাবার জন্য নয়।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে বিয়ের পর যথাসাধ্য মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করার জন্য। স্ত্রীলোকটি যদি সুন্দরী না হয় কিংবা তার মধ্যে যদি এমন কোন ত্রুটি থেকে যায় যার দরুন স্বামীটির পছন্দসই হতে পারেনা তাহলে সহসা মন খারাপ করে পরিত্যাগ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা কিছুতেই উচিত নয়। বরং যথাসম্ভব ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা অনেক সময় এরূপ দেখা গিয়েছে যে একজন স্ত্রীলোক সুন্দরী নয় কিন্তু তার মধ্যে এমন কতগুলো গুণ রয়েছে যা দাম্পত্য জীবনে রূপ সৌন্দর্য অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। সে যদি এই গুণগুলো যথাযথভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায় তাহলে তার সেই স্বামীই যে একদিন মন খারাপ করেছিল এই গুণ বৈশিষ্ট্যও চারিত্রিক সৌন্দর্যের কারণে তারজন্য দেওয়ানা হতে পারে। অনুরূপভাবে দাম্পত্যজীবনের সূচনায় স্ত্রীলোকের কোন কোন জিনিস হয়ত স্বামীর নিকট অপছন্দনীয় হতে পারে এবং সেজন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ভেঙ্গে পাড়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বামী যদি ধৈর্য ধারণ করে স্ত্রীর অন্তর্নিহিত সমস্ত সম্ভাবনার প্রকাশ ও বিকাশ লাভের সুযোগ দেয় তবে একদিন সে নিজেই অনুভব করতে পারবে যে তার স্ত্রীর দোষ অপেক্ষা গুণই রয়েছে অধিক। অনুরূপভাবে স্বামীর ক্ষেত্রেও স্ত্রীর জন্য একই কথা প্রযোজ্য।

কাজেই দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোনরূপ তাড়াহুড়া করা কিছুতেই সমীচিন হতে পারেনা। তালাক একেবারে সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে অনিবার্য পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে এর পূর্বে নয়। রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন 'তালাক জায়েয কাজ হলেও সকল কাজের মধ্যে আল্লাহ ইহাকেই বেশী অপসন্দ করেন।"

অতএব আমাদের উচিত পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মীতার মনোভাব নিয়ে সুখী সুন্দর পারিবারিক জীবন গড়ে তোলা।

www.nagorikpathagar.org

يَـاَيُّهَـــاالَّذِيْنَ امَـنُـوْا لاَتَـاكُلُـوْا اَمْـوَالَكُمْ بَيْـنَكُمْ بِالْبَـاطِلِ الاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَـــارَةً عَنْ تَـرَاضٍ مِّنْكُمْ قف وَلاَتَقْـتُلُوْااَنْفُـسَكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا. ٢٩

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করোনা। কেবলমাত্র তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা লেনদেন করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। সূরা (৪) নিসা ঃ আয়াত-২৯

☆ আলোচ্য আয়াতে একে অপরের সম্পদ আন্যায়ভাবে খেতে নিষেধ করা হয়েছে। পরিভাষার বিচারে খেয়োনা বলতে যে কোনভাবে ভোগ দখল বা হস্তক্ষেপ করোনা বুঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে অথবা অন্যকোন পন্থায় ব্যবহার বা দখল করেই হোকনা কেন। কেননা সাধারণভাবে সম্পদের যে কোন হস্তক্ষেপকেই 'খেয়ে ফেলা' বলা হয়। যদিও সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু না হয়।

এখানে অন্যায় পন্থা বলতে বুঝায় যাহা শরীয়াত ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়েই নাজায়েয। যেমন, ডাকাতি, চুরি, আত্মসাত, বিশ্বাস ভংগ, ঘুষ, সুদ, জুয়া ইত্যাদি। এমনকি স্বাভাবিক ব্যবসাও পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। এখানে আরেকটা অর্থও হতে পারে সমস্ত সম্পদ যাহা কোন ট্রাস্ট। কোন সামাজিক সংস্থা অথবা অন্য কারো সম্পদ যার উপর নিয়ন্ত্রণ আছে নষ্ট না করাও বুঝায়। এবং বৈধ ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করার ইংগিতও রয়েছে।

অতঃপর নিজেদের হত্যা করোনা দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে সম্পদ নষ্ট করা নিজেদেরকে হত্যা করার শামিল। বাহ্যিক অর্থ এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে আমরা যেন কোন প্রকার সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণ করে সম্পদ অর্জনের চেষ্টা না করি। এবং একে অপরকে হত্যা না করি। এমনকি এটা থেকে আত্মহত্যা না করার আদেশও বুঝা যায়। পরিশেষে আল্লাহপাক আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে তিনিই আমাদের বেশী কল্যাণকামী। অতএব আমাদের উচিত তাঁরই আদেশ নিষেধসমূহ যথাযথভাবে মেনে চলা যাতে আমরা সত্যিকার অর্থে কল্যাণ লাভ করতে পারি। কারণ এছাড়া আর কোন পন্থায় কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়।

يَـاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُـوْا لاَتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْـتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَاتَقُوْلُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্থ থাক তখন নামাজের ধারে কাছেও যেওনা যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর ফরয গোসলের অবস্থায়ও যতক্ষণ গোসল করে না নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর

www.nagorikpathagar.org

وَلَاجُنُبًا اِلَّاعَابِرِي سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا، وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍاَوْجَاءَ اَحَدٌمِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّاغَفُوْرًا. ٤٣

যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রস্রাব পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী স্পর্শ (যৌন মিলন) করে থাকে কিন্তু পরে পানি প্রাপ্তি সম্ভব না হয় তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ কর। আল্লাহ নিঃসন্দেহে নম্রতা অবলম্বনকারীও অতীব ক্ষমাশীল। সূরা (৪) নিসা ঃ আয়াত-৪৩

☆ আলোচ্য আয়াতটি মদ্যপান তথা নেশা হারাম করার ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় নির্দেশ। প্রথম নির্দেশ সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে নেশা করাকে খারাপ বলে লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে (নিসা-৪৩) আরেকটু অগ্রসর হয়ে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ সতর্ক সাহাবী নেশা হারাম হওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ (সূরা মায়েদার ৯৩ নং আয়াত) নাযিল হওয়ার পূর্বেই নেশা করা ত্যাগ করেছিলেন। এই আয়াত থেকেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই উপদেশ দিয়েছেন যে, কেহ যদি ঘুমে অধিক কাতর হয়ে পড়ে এবং নামায আদায় করার সময় বারবার তন্দ্রাবিস্ট হয়ে পড়ে তবে নামাজ সংক্ষিপ্ত করে ঘুমাতে যাওয়াই কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতে আরো যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে কেহ যদি অজুহীন হয় কিংবা কারো গোসল করার প্রয়োজন হয় কিন্তু পানি পাওয়া না যায় তবে সে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করবে। আর যদি কেহ অসুস্থ ও রোগগ্রস্থ হয় এবং গোসল বা অযু করলে ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় তবে পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম করার অনুমতির সুযোগ সে গ্রহণ করতে পারে।

তায়াম্মুম শব্দের অর্থ ইচ্ছা ও সংকল্প করা আর তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র মাটি অথবা ধূলিকণা দ্বারা শুধুমাত্র মুখমন্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত মসেহ করাই যথেষ্ট। আসলে তায়াম্মুম হচ্ছে পবিত্রতার অনুভূতি লাভ করা। নামাজের সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য ইহা একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থা মাত্র।

পরিশেষে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে তিনি অত্যন্ত নম্রতা অবলম্বনকারী ক্ষমাশীল। তাই তিনি পানি পাওয়া না গেলে অথবা কষ্ট বাড়ার সম্ভাবনা থাকলে ওজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম এর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র দেখতে চান তাঁর বান্দারা

www.nagorikpathagar.org

তাঁর হুকুম পালনে কতটা প্রস্তুত। অতএব আমাদের উচিত কখনই নামাজ ত্যাগ বা কাজা না করা। পানি পাওয়া না গেলেও তায়াম্মুম করে হলেও নামাজ আদায় করা।

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الاَمْرِمِنْكُمْ، فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌوَّاَحْسَنُ تَاوِيْلاً. ٥٩

হে মুমিনগণ! আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূল (সঃ)-এর এবং সেই সব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন। আর তোমাদের মধ্যে যদি কোন মত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি প্রত্যার্পন করা যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমানদার হও। ইহাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও ইহাই উত্তম। সূরা (৪) নিসা, আয়াত-৫৯।

☆ আলোচ্য আয়াতটি ইসলামের গোটা ধর্মীয় তাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি বিশেষ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের এটা প্রাথমিক ধারা। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ চিরন্তন মূলনীতি হিসেবে স্থির করে দেয়া হয়েছে। (১) ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় মূল আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম আল্লাহর বান্দাহ ইহার পর অন্য কিছু। মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন বিধান উভয়েরই কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতা। অন্যকোন প্রকারের আনুগত্য ও বাধ্যতা কেবলমাত্র তখনই কবুল করা যেতে পারে যখন তা আল্লাহর আনুগত্য ও বাধ্যতার বিপরীত হবে না।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-

لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থাৎ স্রষ্টার নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যেতে পারে না।

(২) ইসলামী জীবন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে রাসূল করীম (সঃ)-এর আনুগত্য। মূলত একোন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র আনুগত্য নয় বরং আল্লাহর আনুগত্যের এটাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব পথ। রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করলেই শুধু আল্লাহর আনুগত্য হতে পারে। রাসূল (সঃ)-এর সমর্থিত পন্থা ব্যতীত অন্যকোন পন্থায় আল্লাহর আনুগত্য হতে পারে না। আর রাসূলের (সঃ) আনুগত্য প্রত্যাহার করলেই আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-

www.nagorikpathagar.org

مَنْ اَطَاعَنِیْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ وَمَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ عَصَی اللّٰهُ.

যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল, যে আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। (৩) উল্লিখিত দুইপ্রকার আনুগত্য ইসলামী রাষ্ট্রের মুসলমান জনগণের উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে তা হচ্ছে 'উলিল আমর' রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের আনুগত্য যারা স্বয়ং মুসলিম সমাজেরই মধ্য হতে হবে, মুমিন হতে হবে। আলিম রাজনৈতিক নেতা, দেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী অথবা শাসন ব্যবস্থার পরিচালক, আদালতের বিচারক কিংবা সামাজিক সাংস্কৃতিক নেতা সকলেই 'উলিল আমর' পরিভাষার অন্তর্ভূক্ত। এক কথায় সমাজের যে স্তরে যে বিষয়ে যারা মুসলমানদের সামাজিক দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত, তারাই সেক্ষেত্রে জনগণের আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী, এবং তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করে মুসলমানদের সমষ্টিগত জীবনে কোনপ্রকার অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকরা কোন রকমেই জায়েয হতে পারেনা, তবে এর জন্য শর্ত এই যে দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের অবশ্যই আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর একান্ত অনুগত হতে হবে। এদু'টি বিষয় মুসলমানদের আনুগত্য পাওয়ার জন্য শর্ত। হাদীসেও রাসূল (সঃ) বলেছেন-

لَاطَاعَةَ فِیْ مَعْصِیَةٍ اِنَّ مَاالطَّاعَةَ فِیْ الْمَعْرُوْفِ.

আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) নাফরমানীর কাজে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবেনা। আনুগত্য করতে হবে শুধু মারুফ তথা বৈধ কাজের। (বোখারী ও মুসলিম)

(৪) আলোচ্য আয়াতে (নিসা-৫৯) চতুর্থ যে নীতিটি চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তা এই যে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ও চূড়ান্ত সনদ হচ্ছে আল্লাহর আইন ও রাসূল (সঃ)-এর আদর্শ। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে অথবা সরকার ও জনগণের মধ্যে যে কোন ব্যাপারেই বিরোধের সৃষ্টি হবে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাহকেই ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এবং তা থেকে যে ফয়সালাই পাওয়া যাবে তার সম্মুখে আনুগত্যের মস্তক অবনত করতে হবে। এভাবে জীবন সমস্যার সমগ্র ব্যাপারেই আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে চূড়ান্ত বিধান হিসেবে মেনে নেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের এমন একটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা তাকে কুফরী শাসন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেয়। যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এই জিনিষটি থাকবেনা তা নিশ্চিত রূপে একটি অনৈসলামী রাষ্ট্র।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, যদি বাস্তবিকই আমরা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকি তবে অবশ্যই আমরা সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করব এবং পরিণামে এটাই সর্বোত্তম বলে প্রমাণিত হবে।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا. ٧١

হে মুমিনগণ! (শত্রুর সাথে) মুকাবিলা করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাক এবং (সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে) আলাদা আলাদা বাহিনী রূপে কিংবা সকলে একত্রিত হয়ে বের হও। সূরা (৪) নিসা, আয়াত-৭১

☆ আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত দেয়া হয়েছে। প্রথমত যুদ্ধের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা। আমরা ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত কুফরী শক্তি ইসলামকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য নিরন্তন চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং সর্বদাই ইসলাম ও ইসলামী সমাজ এবং রাষ্ট্রকে সর্বাত্মক আক্রমনের মুখে রেখেছে। অতএব আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হল সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা- একটি পূর্ণাংগ ও সর্বাত্মক যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত পূর্ণ প্রস্তুতি ও পূর্বসতর্কতা ছাড়া কোন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। যুদ্ধে অবশ্যই আমাদেরকে যথাযথ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যখন আমরা যুদ্ধে যাব অবশ্যই সাহসিকতার সাথে যাব। আমাদেরকে অবশ্যই (যৌথ মানসিক শক্তি) একতার মনোভাব নিয়ে এগুতে হবে। একাকী, ছোট ছোট দলে অথবা সকলে একসাথে যেভাবেই অগ্রসর হইনা কেন আমাদেরকে অবশ্যই স্বার্থপরতা ত্যাগ করে আমাদের নেতার নির্দেশানুযায়ী (কেন্দ্রীয় কমান্ড) অগ্রসর হতে হবে। আমাদের অবশ্যই সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হতে হবে এবং কোন প্রকার মুনাফেকীর জন্য যেন আমাদের কেহ পিছিয়ে না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। এবং সর্বোপরি ইসলামের স্বার্থকে আমাদের ব্যক্তি স্বার্থের উপর স্থান দিয়ে জীবন বাজী রেখে অগ্রসর হতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ، كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলোনা যে, তুমি মুসলমান নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো ইতিপূর্বে এমনি ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। অতএব এখন

www.nagorikpathagar.org

فَتَبَيَّنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا. ٩٤

অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজ কর্মের খবর রাখেন। সূরা (৪) নিসা, আয়াত ৯৪

☆ আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত 'ধারাবাতুম ফি সাবিলিল্লাহ' শব্দের অর্থ আল্লাহর পথে সফর অথাৎ জিহাদ, অথবা সৎব্যবসা বাণিজ্য, অথবা অন্যকোন কাজ যা পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় সবই বুঝায়। যদিও আয়াতটি জিহাদ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে তবুও উল্লেখিত শব্দে ব্যাপক অর্থ প্রকাশের সুযোগ রয়েছে।

'আসসালামু আলাইকুম' মুসলমানদের চিহ্ন ও সভ্যতার অংগ হিসেবে পরিচিত। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানকে দেখে এই শব্দটি বলে এই অর্থে যে আমি তোমারই দলের লোক, তোমার বন্ধু ও কল্যাণকামী। সৈন্য বাহিনী ও গোয়েন্দাদের মধ্যে যেমন বিশেষ সাংকেতিক শব্দ থাকে (Password) এবং সন্দেহ নিরসনে এটা ব্যবহার করে তদ্রুপ সালামও মুসলমানদের জন্য অনুরূপ একটি সাংকেতিক শব্দ। বিশেষত প্রাথমিক যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক ছিল। তখন আরবের নও মুসলিম ও কাফেরদের মধ্যে পোষাক, ভাষা ও অন্যান্য ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন পার্থক্য ছিলনা। আর সে কারণেই একজন মুসলমান অন্যজনকে প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে পারত না। বিশেষত যুদ্ধের সময় একারণে জটিলতার সৃষ্টি হতো। মুসলমানগণ যখন কোন কাফেরের উপর আক্রমন চালাত এবং উহার মধ্যে কোন মুসলমানও আক্রমনের শিকার হত তখন সে নিজের মুসলমান হওয়ার কথা আক্রমনকারী মুসলমানকে জানাবার জন্য 'আসসালামু আলাইকুম' অথবা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠত। কিন্তু মুসলমানদের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ হত যে, এ ব্যক্তি মূলত কাফের ও হতে পারে জান বাঁচানোর জন্য এ শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে পেশ করে তার সম্পর্কে হালকাভাবে একথা বলে দেয়ার সুযোগ নেই যে অথবা কোন অধিকার নেই যে, সে কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে। যদিও তার সত্যবাদী কিংবা মিথ্যাবাদী হওয়ার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকৃত ব্যাপারতো তদন্তের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। তদন্ত ছাড়া ছেড়ে দিলে একজন কাফিরের মিথ্যা বলে প্রাণ বাঁচানোর সম্ভাবনা থাকে সেখানে বিনা তদন্তে হত্যা করলে একজন নিরাপরাধ মুসলমান নিহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই একজন কাফিরকে মুক্তি দিলে যে ভুল সে ভুল একজন মুসলমানকে হত্যা করার মত ভুল অপেক্ষা অনেক ভাল। মূল কথা এই যে কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলে তাকে বিনা তদন্তে অমুসলিম বলা যাবেনা।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ، اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْفَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا، وَاِنْ تَلْوٗا اَوْتُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا. ١٣٥

হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ধারক হও, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাংখী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা বাসনার অনুসরণ করোনা। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্পর্কেই অবহিত। সূরা (৪) নিসা, আয়াত-১৩৫।

☆ আলোচ্য আয়াতে শুধু ইনসাফের নীতি মেনে চল একথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে ইনসাফের ধারক হও। কেননা কেবল ইনসাফ করাই আমাদের কাজ নয় বরং ইনসাফের পতাকা উর্ধ্বমুখী রাখাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। জুলুমকে নির্মূল করে তদস্থলে ইনসাফ, আদল ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইনসাফের প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য যে পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্ভরতা আবশ্যক মুমিন হওয়ার কারণে আমাদেরকে সেস্থান গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সাক্ষ্যদান একান্তভাবে আল্লাহর জন্য হতে হবে। এতে কে লাভবান হলো বা কে ক্ষতিগ্রস্থ হল সেটা দেখা যাবেনা। বরং এ সাক্ষ্যদান যদি নিজের কিংবা নিজের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন যার বিরুদ্ধেই থাকনা কেন সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। ধনীদের থেকে কোন স্বার্থ হাসিল কিংবা গরীবের প্রতি দয়াও যেন আমাদেরকে সত্যের উপর থেকে বিচ্যুত না করে। আল্লাহই সবচেয়ে বড় দয়ালু। তিনিই সবার জন্য যেটা কল্যাণকর সেটারই ব্যবস্থা রেখেছেন। অতএব আমাদেরকে সত্য এবং শুধুই সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। এমনকি সাক্ষ্য এমন রাখ ঢাক ও ঘুরিয়ে পেচিয়ে দেয়া যাবে না যাতে সত্যটা ঘোলাটে হয়ে যায়, ঢাকা পড়ে যায়। বরং নিরেট সত্যটা উদঘাটন হয় এভাবেই বলতে হবে। আলোচ্য আয়াতে একই সংগে সত্যের উপর অটল থাকার এবং সত্য সাক্ষ্য দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এবং এ পথে যে প্রতিবন্ধকতা তথা মানবীয় দুর্বলতা, ত্রুটি, বিচ্যুতি সেগুলো সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত

www.nagorikpathagar.org

করা হয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে নিজেও যেন ন্যায় নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায় নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তাহচ্ছে দুষ্ট ও অবাধ্য লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরাতো ন্যায়নীতির ধার ধারবেইনা বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবেনা। তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে এবং এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তবে জনসাধারণকে সরকার যাতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তার জন্য সত্য সাক্ষ্য তথা সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ، وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا. ١٣٦

হে মুমিনগণ! ঈমান আন আল্লাহর প্রতি তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি নাযিল করেছেন। সেই কিতাবের প্রতিও ঈমান আন যা আল্লাহ তাআলা ইহার পূর্বে নাযিল করেছেন। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাবর্গ তাঁর কিতাব সমূহ তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরি করল সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেল। সূরা (৪) নিসা, আয়াত-১৩৬।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে আবার ঈমান আনতে বলা হয়েছে। বাহ্যদৃষ্টিতে এটা খুবই আশ্চর্যজনক মনে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে ঈমান শব্দটি দুটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার এক অর্থ হচ্ছে “অস্বীকারের পথ” ত্যাগ করে “স্বীকারের পথ” অবলম্বন করা- যারা মানেনা তাদের সংস্পর্শ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা মানতে প্রস্তুত তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া। অর্থাৎ মুখে মুখে ঈমানের পথ অবলম্বনের স্বীকারোক্তি করা। এর দ্বিতীয় অর্থ ঈমানকে মুখ থেকে অন্তরে স্থান দেওয়া। অর্থাৎ যা মানবে তা আন্তরিকতার সাথেই মানবে। পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে মানবে। নিজের চিন্তা রুচি পছন্দ ও দৃষ্টি ভংগীকে নিজের মন মানস ও চাল চলনকে এবং নিজের বন্ধুত্ব শত্রুতা চেষ্টা

www.nagorikpathagar.org

সাধনার ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে নিজের ঈমানানুগ আকীদা অনুসারে গড়ে নিবে। যেসব মুসলমান ঈমানের প্রথম অর্থের দিক দিয়ে মুমিন অর্থাৎ কেবল মাত্র মুখে স্বীকার করে মানতে যারা প্রস্তুত তাদের মধ্যে শামিল সেই সব মুসলমানদেরকে অত্র আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। এবং তাদেরকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে খাঁটি মুমিন হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে কুফরীর দু'টি অর্থ হতে পারে। (১) স্পষ্টভাষায় অস্বীকার করা। (২) মুখে মেনে নেয়া কিন্তু অন্তর দিয়ে না মানা। কিংবা নিজের বাস্তব কাজ ও আচরণ দ্বারা এই কথা প্রমাণ করা যে, যা সে মানবার দাবী করে প্রকৃতপক্ষে তা মানেনা। এখানে কুফর শব্দ হতে এদু'টি অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে এবং আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে লোকদেরকে এদিক দিয়ে সতর্ক করে দেয়া যে ইসলামের বর্ণিত আকীদাগুলোর সাথে কুফরীর উল্লেখিত দুইপ্রকারের মধ্যে যে ধরনেরই আচরণ গ্রহণ করা হবে, সত্য হতে দূরবর্তী হওয়া ও বাতিলের পথে বিভ্রান্ত ও ব্যর্থ হওয়া ভিন্ন এর আর কোন ফল হতে পারেনা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا. ١٤٤

হে মুমিনগণ! তোমরা কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা মুমিনদেরকে ত্যাগ করে। তোমরা কি আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও? সূরা (৪) নিসা, আয়াত-১৪৪।

☆ পূর্ববর্তী ১৩৬ নং আয়াতে মুমিনদেরকে একনিষ্ঠ ও আন্তরিকভাবে ঈমান আনার এবং কথা ও কাজে কোনভাবেই কুফরী না করার জন্য সতর্ক করে দেয়ার পর এখানে আরেকটি ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে কাফিরদেরকে তথা অমুসলিম ও মুনাফিকদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবেনা। এই আয়াত এতই সুস্পষ্ট যে এখানে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে এতে তার ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা প্রবেশ করবে এবং এই কাফেররা কোন না কোনভাবে মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করবে। অন্যান্য আয়াতে এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আরো সতর্ক করা হয়েছে যে, কেহ যদি কাফিরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তবে এটা আল্লাহর নিকট তার ঈমানের বিরুদ্ধে কুফরীর নিদর্শন হিসেবে গন্য হবে। এবং এটাকে তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল বলা হয়েছে। হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরশীল অতএব তোমরা বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাক। এই হাদীসটি অত্র আয়াতেরই একটা প্রতিধ্বনী মাত্র। অতএব আমাদের উচিত কোন কাফিরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করা এবং নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে একটা সুস্পষ্ট দলিল তুলে না দেওয়া।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ، اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ، اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ. ١

হে মুমিনগণ! তোমরা বন্ধনসমূহ (অঙ্গীকার সমূহ) মেনে চল। তোমাদের জন্য গৃহপালিত ধরনের জন্তু সমূহ হালাল করা হয়েছে যা তোমাদের কাছে বিবৃত করা হবে তা ব্যতীত। কিন্তু ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করোনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন নির্দেশ দেন। সূরা (৫) আল মায়েদা-০১।

☆ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে এনিয়েই একটি বিরাট বই লিখা যায়। বিবাহের 'আকদ' শব্দের সাথে আমরা সুপরিচিত। এখানে 'আউফুবিল উকুদ' বলে এই বন্ধন- অংগীকার সমূহ বুঝানো হয়েছে। অংগীকার বন্ধন অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন- আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহদের মধ্যে ঈমান ও এবাদাত সম্পর্কিত অথবা হালাল হারাম সম্পর্কিত এই আয়াতেরই পরবর্তী অংশে যেমনটি বলা হয়েছে। মানুষ পরস্পরের মধ্যে যেসব অংগীকার করে থাকে যেমন বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, চুক্তি, পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ইত্যাদি সবকিছুই এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।

এছাড়াও দুই ব্যক্তি, দুইদল অথবা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্ত চুক্তি হয়ে থাকে এখানে সেটাও উদ্দেশ্য হতে পারে। এবং যে কোন পর্যায়েরই হোকনা কেন সমস্ত বন্ধন-অংগীকার পূর্ণ করার জন্য মুমিনদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পরবর্তী অংশে আনআম (চতুষ্পদ জন্তু) শব্দটি আরবী ভাষায় উট, গরু, ভেড়া, ছাগল বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর রাহীমাত শব্দটি ব্যাবহৃত হয় সকল প্রকার বিচরণশীল চুতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে। আল্লাহ যদি শুধু, এতটুকু বলতেন যে, 'আনআম' তোমাদের জন্য হালাল করা হল তবে তাতে কেবলমাত্র উপরোক্ত চারটি প্রাণী হালাল হত। কিন্তু তার পরিবর্তে বলা হয়েছে গৃহপালিত ধরনের বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এতে মূল আদেশ অনেকখানি ব্যাপক হলো। এই আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয়- তা হচ্ছে এই যে, এখানে হালালকে নির্দিষ্ট করা হয়নি

বরং বলা হয়েছে যা কিছু হরাম বলে বিবৃত করা হবে তাছাড়া সবই হালাল। কোন কোন ধরনের জন্তু, জানোয়ার পশু-পাখি হারাম তা আমরা কোরানের অন্যান্য আয়াত এবং হাদীস থেকে বিস্তারিত জানতে পারি। এ সম্পর্কে কিছু মতভেদও থাকতে পারে তাই এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অনেক বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম। হজ্জ ও ওমরা করার জন্য সেলাই বিহীন একখানা লুংগী ও সেলাই বিহীন একখানা চাদর পরা হয়-কাবার, (মক্কার) নির্দিষ্ট সীমায় প্রবেশ করার আগেই এটা পরে নিতে হয় এটাকে বলে ইহরাম। এই ইহরাম বাঁধা অবস্থায় সকল প্রকার শিকার করা নিষেধ এমনকি কাহাকেও শিকারের সন্ধান বলে দেয়াও নিষেধ। পরিশেষে বলা হয়েছে আল্লাহ হচ্ছেন নিরংকুশ হুকুম দাতা। তিনি যাহা ইচ্ছা হুকুম দিতে পারেন। তাঁহার প্রদত্ত আদেশ নিষেধের ব্যাপারে কোন প্রকার আপত্তি করারই নেই। অধিকার কারোই নেই। যদিও তাঁহার সব হুকুম আহকামই নিশ্চিতভাবে কল্যাণমূলক এবং যুক্তিসংগত। কিন্তু ঈমানদার বান্দাহ একথা মনে করে তাঁর হুকুম পালন করেনা যে, তাহা খুব যুক্তিসংগত বা কল্যাণমূলক মনে হয়েছে। বরং তা পালন করে এই বিশ্বাস নিয়ে যে তা একমাত্র মালিকও প্রভুর নির্দেশ। তিনি যা হারাম করেছেন তা শুধু এজন্যই হারাম যে, মহান প্রভু আল্লাহ নিজেই উহা হারাম ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে যা তিনি হালাল করেছেন তা হালাল একমাত্র এইজন্য যে, সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী এবং উপায় উপাদানের মালিক আল্লাহ বান্দাকে তাহা ব্যবহারের অনুমতি দান করেছেন। ঠিক এজন্যই কুরআন মজিত অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ঘোষণা করেছে যে দ্রব্যসামগ্রীর হারাম কিংবা হালাল হওয়ার ব্যাপারে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপ বাবে বান্দাহর পক্ষে কোন কাজ জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার একমাত্র ভিত্তি এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ যা কিছু জায়েয ঘোষনা করেছেন তা , শুধু তাই জায়েয আর তিনি যা কিছু না জায়েয ঘোষণা করেছেন তা একেবারেই না জায়েয।

আলোচ্য আয়াতে হারাম জন্তু জানোয়ার, খাদ্য ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হয়নি বলা হয়েছে একটু পরে বর্ণনা করা হবে। অতঃপর ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম আয়াতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটা অনেক বিস্তারিত আলোচনা সম্মানিত পাঠক পাঠিকারা নির্ভরযোগ্য কোন হালাল হারামের বই এবং এই আয়াতগুলোর তাফসীর নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ সমূহে দেখে নিতে পারেন। যেমন মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রঃ) এর তাফসীরে মাআরেফুল

www.nagorikpathagar.org

কুরআন অথবা এর বঙ্গানুবাদ কোরআনুল করীম অথবা তাফহীমূল কুরআন ইত্যাদি। আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভীর ইসলামে হালাল হারামের বিধান এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَاالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَاالْهَدْىَ وَلَاالْقَلَائِدَ وَلَاآمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وَاِذَاحَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا، وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا، وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى، وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ. ٢

হে মুমিনগণ! আল্লাহ পরস্তির নিদর্শন সমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করোনা। হারাম মাস সমূহের কোন মাসকে হালাল করে নিওনা। কুরবানীর জন্তু জানোয়ারগুলোর উপর হস্তক্ষেপ করোনা। সেসব জন্তুর উপরও হস্তক্ষেপ করোনা যে সবের গলদেশে খোদায়ী মানতের চিহ্ন স্বরূপ পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে। সেসব লোককেও কোনরূপ কষ্ট দিওনা যারা নিজেদের পরোয়ার দিগারের অনুগ্রহ এবং তার সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে পবিত্র ও সম্মানিত ঘর কাবায় (মক্কা) যাচ্ছে। ইহরাম অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পার। আর দেখ একদল লোক যে তোমাদের জন্য মসজিদে হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে সেজন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতদূর উত্তেজিত করে না তোলে যে, তোমরাও তাদের মুকাবিলায় অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু করবে। যেসব কাজ পূন্যময় ও আল্লাহর ভয়মূলক সেসব কাজে সকলের সাথে সহযোগিতা কর। আর গুনাহ ও সীমা লংঘনের কাজ, তাতে কারো একবিন্দু সহযোগিতা করোনা। আল্লাহকে ভয় কর কেননা তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন। সূরা (৫) আল ইমরান ঃ আয়াত ০১

☆ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ বলে সেই সমস্ত নিদর্শন ও প্রতিভূকে বুঝানো হয়েছে যা শিরক্, কুফরী ও নাস্তিকতার সম্পূর্ণ বিপরীত খালেস খোদা পরস্তির নীতি ও পথের প্রতিনিধিত্ব করে। এই ধরনের চিহ্ন বা নিদর্শন যে মতাদর্শ এবং যে জীবন ব্যবস্থায়ই পরিদৃষ্ট হবে মুসলমান মাত্রই এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হয়েছে। কিন্তু শর্ত এই যে এদের মনস্তাত্বিক পটভূমি খাঁটি একত্ববাদী হতে হবে। কোন

www.nagorikpathagar.org

প্রকার মুশরিকী কিংবা কুফরী চিন্তা কল্পনার পংকিলতা দ্বারা এগুলোকে কিছুমাত্র অপবিত্র করা চলবেনা। কোন ব্যক্তি -নে অমুসলিমই হোকনা কেন যদি নিজ আকীদা ও আমলের দিক দিয়ে এক আল্লাহর বন্দেগী ও ইবাদতের কোন অংশের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে তবে সেই অংশ পর্য্যন্ত আল্লাহ পরস্তির যেসব নির্দশন ও প্রতিভূ বর্তমান থাকবে সে সবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও মুসলমানদের কর্তব্য। এক্ষেত্রে আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা ঝগড়া নহে, বরং পূর্ণ আনুকুল্য থাকবে। তারা আল্লাহর বন্দেগী কেন করছে এই সম্পর্কে তাদের সাথে আমাদের কোন প্রকার ঝগড়া বা মতবৈষম্য নেই। ঝগড়া আছে শুধু এই ব্যাপারে যে তারা আল্লাহর বন্দেগীর সাথে অন্যান্য অনেক প্রকার বন্দেগীকে শামিল করছে। মনে রাখা আবশ্যক এই নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই নির্দেশ দান করা হয়েছিল তখন যখন মুসলমান ও আরবের মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। সুতরাং যুদ্ধ পরিস্থিতির মত চরম অবস্থায় যখন অসম্মান করা যাবেনা তখন অন্যকোন অবস্থায়তো প্রশ্নই উঠেনা। আল্লাহর পর কয়েকটি নিদর্শনের নাম নিয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঐগুলোর অপমান হওয়ার বিশেষ আশংকা দেখা দিয়েছিল। নির্দিষ্টভাবে এই নিদর্শন কয়টির নাম নেয়ার অর্থ এই নয় যে এই কয়টি নিদর্শনই সম্মানযোগ্য অন্য কোন নিদর্শন নয়, না এই উদ্দেশ্য কখনই নয়।

ইহরামও আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম, এবং আর বিধি-নিষেধের মধ্যে কোন একটি ভংগ করাও এই কথাও বলে দেয়া হয়েছে যে ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করলে আল্লাহ পরস্তির নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শনের অপমান করা হবে। অবশ্য শরীয়াতের নিয়মানুযায়ী ইহরামের সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার পর শিকার করার অনুমতি রয়েছে।

পরিশেষে অলোচ্য আয়াতে এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ, প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। আমরা পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রায়শই আবেগ প্রবণতার কারণে ভুল করি, অথবা সীমা লংঘন করি। আমরা দল, এলাকা বা সংকীর্ণ জাতির স্বার্থে প্রায়শই এমন ভূমিকা অবলম্বন করি যেটা ন্যায়নীতির পরিপন্থী। আমার দল ন্যায় করুক বা অন্যায় করুক আমি এটা সমর্থন করি- এই মনোভাবই যাবতীয় অন্যায় অশান্তির মূল। আল কোরআনের নির্দেশ এই যে সমর্থন সহযোগিতা শুধুমাত্র যেক্ষেত্রেই করা যাবে যেটা ভালো কল্যাণময়। অকল্যাণকর কাজে, খারাপ কাজে কখনই সমর্থন করা যাবেনা। অর্থাৎ সমর্থন বা বিরোধিতা হবে কাজের উপর নির্ভর করে ব্যক্তি বা দলের পরিচয়ে নয়। আর কাজের ব্যাপারেও কোনটা ভালো কোনটা খারাপ সেটা মনগড়া ভাবে নির্ধারিণ করলেই চলবেনা। কুরআন এব্যাপারেও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আর ভালো যা কিছু তার প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। এবং

www.nagorikpathagar.org

শুধুমাত্র তাকওয়া ভিত্তিক সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে অন্য কোন কাজে নয়। অতএব আমাদের কর্তব্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং ভালো ও কল্যাণকর কাজে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا، وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ، مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. ٦

হে মুমিনগণ ! তোমরা যখন নামাজের জন্য উঠ তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মসেহ কর এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত কর, অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন কর। আর যদি রোগাক্রান্ত হও অথবা পথে প্রবাসে থাক কিংবা তোমাদের কোন লোক মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা স্ত্রী সহবাস কর আর যদি পানি পাওয়া না যায় তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- অর্থাৎ স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় পবিত্র মাটি দ্বারা মসেহ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চাননা কিন্তু পবিত্র রাখতে চান। এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সূরা মায়েদা(৫) - আয়াত -৬

☆ আলোচ্য আয়াতে প্রথমত ওজুর ফরজ সমূহ বর্ণনা কর হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- (১) সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা (২)দুহাত কনুই সহ ধৌত করা (৩) মাথা মসেহ করা এবং (৪)পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করা। এছাড়াও রাসূল (সঃ) এর সুন্নাত অনুযায়ী প্রথমে হাত ধুয়ে নিতে হয় এবং মুখমন্ডল ধৌত করার মধ্যে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করাও শামিল রয়েছে।

অপবিত্রতা স্ত্রী সহবাসের কারণে হোক অথবা স্বপ্নদোষের কারণে হোক উভয় অবস্থায়ই গোসল করা (ওয়াজিব) ফরজ। এরূপ অবস্থায় গোসল না করে নামাজ পড়া অথবা

www.nagorikpathagar.org

কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতেও এব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আর পানি পাওয়া না গেলে গোসল ও অযু উভয়টির পরিবর্তেই তায়াম্মুম করা যাবে। এছাড়াও পানি পাওয়া গেলেও যদি রোগাক্রান্ত হয় এবং পানি ব্যাবহারের ফলে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনার আশংকা থাকে তাহলেও তায়াম্মুম করলেই হবে, ওযু-গোসল করা লাগবেনা। তায়াম্মুম করতে পবিত্র মাটি অথবা ধূলিকণা হাতে লাগিয়ে সেই হাত দিয়ে মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মসেহ করে নিলেই হয়। মনের পবিত্রতা যেমন একটি নিয়ামত তেমনি দেহের পবিত্রতাও একটি নেয়ামত। এই উভয় প্রকার পবিত্রতা অর্জন করার মাধ্যমেই নিয়ামতে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। আলোচ্য আয়াতে আমাদেরকে তাঁর এই নেয়ামতের পূর্ণতা প্রাপ্তিকে সহজতা দান করেছেন যেন আমরা সব সময় সকল অবস্থায় পবিত্র অবস্থায় থাকতে পারি। অতএব আমাদের উচিত সদা -সর্বদা পবিত্রতা বজায় রাখা এবং আল্লাহর নেয়ামত সমূহের শুকরিয়া আদায় করা।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ، وَلَايَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّاتَعْدِلُوْا، اِعْدِلُوْا، هُوَاَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى، وَاتَّقُوْااللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُوْنَ. ٨

হে মুমিনগণ ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করোনা। সুবিচার কর, এটাই আল্লাহ ভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত । সূরা মায়েদা(৫) আয়াত- ৮

☆ আলোচ্য আয়াতটি এবং সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতটি প্রায় একই শব্দে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। সূরা নিসায় বলা হয়েছে ‘কিসতে সুহাদা লিল্লাহ’ আর সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে ‘লিল্লাহি সুহাদা বিল কিসতে’। একটি শব্দ আগে পিছে করার একটি সুক্ষ্ম কারণ ‘বাহরে মুহীত’ গ্রন্তে উল্লেখিত হয়েছে- স্বভাবত দু'টি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা প্রদান করে থাকে এবং অন্যায় অবিচারে প্ররোচিত করে। (১) নিজের অথবা আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (২) কোন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নিসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে আর আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে। একারণেই সূরা নিসায় বলা হয়েছে ন্যায় বিচারে অধিষ্ঠিত থাক যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। আর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায় বিচার হতে বিরত না রাখে। অতএব

www.nagorikpathagar.org

সূরা নিসার আয়াতের সারমর্ম এই যে ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরোয়া করা যাবেনা, যদিও ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায় তবুও তাতেই কায়েম থাক। অপরিদকে এই আয়াতের সারমর্ম এই যে ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয়, যা শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে। এই কারণে সূরা নিসার আয়াতে কিস্ত অর্থাৎ ইনসাফকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্য দন্ডায়মান হবে সে আল্লাহর জন্যই দন্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয় স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও আল্লাহর জন্যই। তাই এখানে কিসত শব্দ আগে উল্লেখ করে ইংগিত করা হয়েছে যে সুবিচারের বিপক্ষে কারো প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর জন্য হতে পারে না। সূরা মায়েদায় শত্রুদের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে লিল্লাহ শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবের ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য দন্ডায়মান হয়েছ এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে শত্রুদের সাথেও ন্যায় বিচার কর। মোট কথা এই উভয় আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে (১) শত্রু মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অথবা কারো শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (২) সত্যের সাক্ষ্য সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না- যাতে বিচারক বর্গসত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

আজকাল সাক্ষ্যদান তথা শাহাদাত এর যে অর্থ সর্বসাধারনের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা শুধু মামলা-মোকাদ্দমায় কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কুরআনও সুন্নাহর পরিভাষায় শাহাদাত শব্দটি আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ- যদি ডাক্তার কোন রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরী করার যোগ্য নয় অথবা যোগ্য তবে এটিও একটি শাহাদাত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাপ যদি কিছু লিখা হয় তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য দান হয়ে কবিরা গুনাহ অর্থাৎ অত্যন্ত মারাত্মক গুনাহ হবে। এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নাম্বার দেয়াও একটি শাহাদাত। যদি ইচ্ছাপূর্বক বা শৈথিল্য ভরে কম বা বেশী নাম্বার দেয়া হয় তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে এম. পি., চেয়ারম্যান, মেয়র, কমিশনার, মেম্বার ইত্যাদি জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেয়াও একপ্রকার সাক্ষ্য দান। এতে ভোট দাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি যোগ্যতা, সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য। তার চেয়ে যোগ্য কেউ নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হারজিতের খেলা মনে করে রেখেছে। একারণে

www.nagorikpathagar.org

কখনো টাকার বিনিময়ে, কখনো বা চাপের মুখে কখনো বা সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সন্তা অংগীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়। এমনকি ধার্মিক বলে পরিচিত লোকও অযোগ্য অধার্মিক ব্যক্তিকে ভোট দিতে গিয়ে একথা চিন্তা করেনা যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কবিরা গুনাহ হচ্ছে এবং খোদায়ী অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে। পরিশেষে আবারো আল্লাহপাক তাঁকে ভয় করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে আমরা যে কারণেই হোক যা কিছু করিনা কেন আল্লাহ অবশ্যই তা জানেন। অতএব আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম থাকতে হবে এবং সাক্ষ্য দিতে হবে।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ، وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ. ١١

হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি স্বীয় (জুলুমের) হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহকে ভয় কর। এবং মুমিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। সূরা (৫) মায়েদা ঃ আয়াত-১১

☆ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনে বার বার এমন ঘটনা ঘটেছিল যে, ইসলামের শত্রুরা রাসূল (সাঃ) মুমিন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি তাদের অনুকূল ছিল। সহায়-সম্পদ, জনসমর্থন ইত্যাদি যাবতীয় উপায় উপকরণ তাদের হস্তগত ছিল এবং তাদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের সকল আক্রমণ, চক্রান্ত ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছিলেন, নিস্তেজ করে দিয়েছিলেন ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। কারণ তারা মহা সত্য ইসলাম এবং ইসলামের রাসূল (সাঃ) এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। মূলত এতে তারা আল্লাহর বিরুদ্ধেই অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

এই অবস্থান শুধুমাত্র তখনকার জন্যই ছিলনা। এখনো ইসলাম বিরোধীদের সকল চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং আক্রমণ ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি আমরা সত্যিকার মুমিন হই। আল্লাহকে প্রকৃতই ভয় করি এবং আল্লাহর উপরই একমাত্র ভরসা করি। অর্থাৎ আমাদের অন্তরে প্রকৃত তাকওয়ার স্থান থাকতে হবে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং আল্লাহর উপরই ভরসা করতে হবে। অন্য কোন সহায়-সম্পদ বা শক্তির উপর নির্ভর করা যাবে না।

অতএব আমাদের কর্তব্য প্রকৃত তাকওয়া অর্জন করা এবং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. ٣٥

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। সূরা (৫) মায়েদা ঃ আয়াত-৩৫

☆ আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন- আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অর্থাৎ এমন প্রতিটি উপায় পন্থা ও মাধ্যমকে তোমরা সন্ধান কর যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে এবং তাঁর সন্তোষ পেতে পারবে। আলোচ্য আয়াতেরই পরবর্তী অংশে এই মাধ্যমকে জিহাদ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। জিহাদ শব্দের অর্থ সর্বাত্মক চেষ্টা সাধনা । তবে এর মধ্যে মুকাবিলা করার ভাব বিদ্যমান। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে (আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পথে) যে সব শক্তি প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে, সে সব শক্তি আমাদেরকে আল্লাহর মর্জির পথে চলতে বাধা দান করে ও সে পথ থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টানুবর্তী হয়ে আছে। যে শক্তি আমাদেরকে তার কিংবা অন্যকোন গায়রুল্লাহ শক্তির বান্দাহ ও দাসানুদাস হয়ে থাকতে বাধ্য করে ওদের বিরুদ্ধে নিজেদের সমগ্র সম্ভাব্য শক্তি নিয়োগ করে সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বস্তুত এরূপ চেষ্টা ও সাধণার উপরই আমাদের চিরন্তন সাফল্য ও সার্থকতা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ একান্তভাবে নির্ভর করে। এভাবে আলোচ্য আয়াত মুমিন বান্দাহকে প্রতিটি ফ্রন্টেই চতুর্মুখী লড়াই চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। একদিকে অভিশপ্ত ইবলিস ও তার সৈন্যবাহিনী, অপরদিকে মানুষের নফস ও তার বিদ্রোহী লালসা বাসনা, তৃতীয় দিকে আল্লাহ বিমুখ অসংখ্য মানুষ রয়েছে যাদের সাথে আমরা সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সম্বন্ধের জালে বন্ধী হয়ে রয়েছি। আর চতুর্থ দিকে রয়েছে ভ্রান্ত ধর্মীয় তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহের উপর প্রতিষ্ঠিত ও আল্লাহর বন্দেগীর পরিবর্তে বাতিলের বন্দেগী করতেই মানুষকেই বাধ্য করে। এই সকলের কলা কৌশল ও হাতিয়ার বিভিন্ন ধরনের কিন্তু সকলের চেষ্টার মূল লক্ষ্য একই। তাহল মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের বান্দাহ ও অনুগত বানানো। এর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে রয়েছে আল্লাহ প্রাপ্তির পথ। মানুষের উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ পর্যন্ত তার অগ্রগতি এই কাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে যে, সে পুরাপুরি আল্লাহর বান্দাহ হয়ে চলবে এবং ভিতরে বাহিরে খালেসভাবে তাঁরই বান্দাহ হয়ে থাকবে। কাজেই তাঁর মূল লক্ষ্য অবধি পৌঁছার জন্য একান্ত অপরিহার্য হচ্ছে এই সমস্ত প্রতিবন্ধক, প্রতিরোধক ও বাধাদানকারী শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে একই সময়ে যুদ্ধ ঘোষণা করা, প্রতিটি মূহুর্ত ও প্রতিটি অবস্থায় এদের সাথে লড়াই ও সংঘর্ষে লিপ্ত থাকা এবং এই সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতাকে খতম করে আল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়া। এটাই সাফল্য অর্জনের একমাত্র পথ।

অতএব আমাদের উচিত সার্বক্ষণিকভাবে এই জিহাদের সৈনিক হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى أَوْلِيَاءَ، بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ. ٥١

হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদেরকে পত প্রদর্শন করেন না। সূরা (৫) মায়েদা আয়াত-৫১।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক রাখেনা। এরপরও যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান অথবা অমুসলিমের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই সম্প্রদায়ের লোক বলে গণ্য হবে। সূরা আল ইমরানের ১১৮ নং আয়াতে এব্যাপারে বলা হয়েছে "হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের অমংগল সাধনে কোন ক্রুটি করেনা। তোমরা কষ্ট পেলেই তাদের আনন্দ। শক্রতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফসকে বেরোয় আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করা হল যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।" সূরা নিসার ১৪৪ নং আয়াতে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে - "হে মুমিনগণ! তোমরা কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, মুমিনদেরকে ত্যাগ করে। তোমরা কি আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলীল তুলে দিতে চাও?" উপরোক্ত তিনটি আয়াত একসাথে চিন্তাভাবনা করলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে যায় কেন আল্লাহপাক অমুসলিমদেরকে অন্তরংগ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। অমুসলিমদের হিংসা-বিদ্বেষ কত গভীর এবং মারাত্মক এবং তাদের বন্ধুত্ব কি চরম পরিণতি ডেকে আনবে।

এছাড়াও আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইতিহাসের দিকে একটু তাকালে পরিষ্কার বুঝতে পারি তাদের কাছে কখনো বন্ধুত্ব অথবা সাহায্য সহযোগিতার জন্য হাত বাড়ানো আর নিজের ধ্বংস ডেকে আনা সমার্থক। এবং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বক্ষেত্রে একতাবদ্ধ। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে তাদেরকে কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতাকারী বলে মনে হতে পারে কিন্তু এটা খুবই সাময়িক অথবা বিশেষ পলিসীর কারণেই হয়ে থাকে, মুসলমানদের বৃহত্তর কোন ক্ষতি করার জন্যই তারা এধরনের মেকী সহযোগিতার হাত বাড়ায়। আমরা ফিলিস্তিন, কাশ্মীর,

www.nagorikpathagar.org

বসনিয়া, চেচনিয়া, মিন্দানাও, তিমুর, ইরাক ইত্যাদি বিশ্বের যে কোন ঘটনার দিকে তাকালেই তাদের বন্ধুত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

অতএব আলোচ্য এই আয়াতগুলো, কোরানের এই নির্দেশসমূহ কি আমাদের হুশ ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট নয়?

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗۤ، اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ، يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَاۤئِمٍ، ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ. ٥٤

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে (যাক না!) অচিরে আল্লাহপাক এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি বিনয়ী নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবেনা। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

সূরা (৫) মায়েদা ঃ আয়াত -৫৪

☆ যেহেতু পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই বিদ্রোহী সেহেতু কিছু লোকের ধর্মত্যাগী হওয়া অসম্ভব নয়। এমনকি ইসলামের মত এমন সাধারণজ্ঞান ও যুক্তিবাদী ধর্মের কেহ কেহ ধর্মত্যাগী হতে পারে। এখানে মুমিনদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে তারা যেন ইহুদীদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করে, তারা যেন আত্মতুষ্টিতে বিভোর হয়ে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে বিমুখ হয়ে না যায়। যদি তারা এরূপ করে তবে এটা তাদেরই ক্ষতি, কারণ আল্লাহর অনুগ্রহ কোন দল বা গোষ্ঠীর উপর সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন সময় যে কোন লোক বা দলকে তিনি সত্যিকার ইসলামের অনুসারী করে তুলতে পারেন। সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- (১) আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে। এখানে আল্লাহর সাথে তাদের ভালাবাসা কোন কোন স্তরে স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়াও স্বাভাবগত ভালবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয় কিন্তু এর উপায় উপাদানগুলো ইচ্ছাধীন। যেমন আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি, সামর্থ এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়াতমরাজীর ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের মনে আল্লাহর প্রতি স্বভাবজাত ভালবাসার সৃষ্টি করে দেয়। কিন্তু মানুষের সাথে আল্লাহর ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যত মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থের বাহিরে তা মানুষকে শুনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই। কিন্তু কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে এ ভালবাসার

www.nagorikpathagar.org

উপায় উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এগুলোকে কাজে লাগায় তবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা অবশ্যাম্ভাবী। যেমন আল্লাহ্পাক কুরআনে বলেছেন-"হে রাসূল আপনি বলে দিন যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন।" এ আয়াত থেকে জানা যায় যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা লাভ করতে চায় তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সুন্নাতের অনুসরণে অবিচল থাকা। এমন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। (১) তারা মুমিনদের প্রতি নম্র ও বিনয়ী। অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কখনই শক্তি বা অস্ত্র প্রয়োগ করবেনা। স্বীয় মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, অর্থসম্পদ ও দৈহিক বল কোন একটি জিনিষকেই সে মুসলিমদিগকে দমন করার, নির্যাতন নিষ্পেষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত করার কাজে ব্যবহার করবেনা। মুসলিমগণ সবসময়ই পরস্পরের প্রতি বিনয়ী, দয়াদ্র হৃদয়, সহানুভূতিশীল, ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু ব্যক্তি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করবে।

(৩) কাফেরদের প্রতি কঠোর অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি স্বীয় ঈমানের পরিপক্কতা, দ্বীনদারী, নিষ্ঠা নিয়মনীতি পালনের দৃঢ়তা, নৈতিক চরিত্রের বলিষ্ঠতা এবং ইমানী বুদ্ধিমত্তার কারণে ইসলামের দুষমনদের সামনে ইস্পাতের মত কঠিন ও পাথরের ন্যায় দূর্ভেদ্য হয়ে দাঁড়াবে। কোন অবস্থায়ই স্বীয় অবস্থান হতে তাকে বিচ্যুত করা সম্ভব হবেনা। কাফেররা কখনো তাকে মোমের মত দুর্বল এবং নরম কচি ঘাস মনে করবেনা। যখন কাফেরদের সাথে মুমিনের মুকাবিলা হবে তখন কাফির একথাই মনে করতে বাধ্য হবে যে, আল্লাহর এই বান্দাহ চূর্ণ হতে পারে কিন্তু কোন অবস্থায়ই এবং কোন মূল্যেই বিক্রয় বা নত হতে পারে না এবং কোনোভাবেই ভয়ে ভীত ও দমিত হতে পারেনা। মূল কথা এই যে তাদের ভালবাসা ও ঘৃণা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে। তাদের সমস্ত ভালবাসা ও শক্তি সামর্থ তাদের জন্য নিয়োজিত যাদেরকে আল্লাহ্পাক ভালবাসবেন। অর্থাৎ "মুমিন যারা" আর তাদের ঘৃণা ও কঠোরতা তাদের জন্য যাদেরকে আল্লাহ্পাক অপছন্দ করেন অর্থাৎ কাফির।

(৪) তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে অর্থাৎ তারা আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে। কারণ কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং নম্র বা কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দীপনা থাকতে হবে। এসম্পর্কে কুরআনে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে যা পরবর্তী আলোচনায় আসবে।

(৫) এই কাজে অর্থাৎ জিহাদে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবেনা। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দুটি বিষয় প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে (ক) বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং (খ) আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার।

www.nagorikpathagar.org

দেয় অথবা উৎসাহিত করে তথাপিও তাদের সংস্পর্শে থাকলে ধর্মের প্রতি আমাদেরও আন্তরিকতা হ্রাস পাবে। আমাদের ঐকান্তিকতায় ধ্বস নামবে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশের তথাকথিত প্রধান কবি ও বুদ্ধিজীবি নামধারীদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে হয় যারা নিজেদের কবিতায়, প্রবন্ধে, রচনায়, উপন্যাসে ও গল্পে বক্তৃতা বিবৃতিতে এবং সিনেমা ও নাটকে ইসলাম ও ধার্মিকতাকে উপহাস করেছে এবং করে চলেছে তাদের নাম পরিচয় যাই হোক না কেন? অতএব আমাদের কর্তব্য এদের সকলকে বর্জন করা এবং প্রতিহত করা।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآاَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا، اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ. ٨٧

হে মুমিনগণ! যে পবিত্র জিনিষগুলো আল্লাহ হালাল করেছেন তোমরা সেগুলোকে হারাম করোনা এবং সীমা লংঘন করোন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের অপছন্দ করেন। সূরা (৫) মায়েদা ঃ আয়াত-৮৭

☆ আলোচ্য আয়াতে দু'টো কথা বলা হয়েছে- (১) তোমরা নিজেরাই হালাল ও হারাম করার স্বাধীন অধিকারী হয়ে বসোনা। শুধুমাত্র আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা-ই হালাল এবং যা হারাম করেছেন তা-ই হারাম। নিজেদের ইচ্ছামত কোন হালাল বস্তুকে হারাম করলে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তোমরা নফসের ও প্রবৃত্তির দাস হয়ে বসবে। (২) খ্রীস্টান পাদ্রী, হিন্দু যোগী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং প্রাচ্য দেশীয় তাসাউফবাদীদের মত দুনিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যবাদ ও দুনিয়ার বৈধ স্বাদ আস্বাদন পরিহার করার নিয়ম অবলম্বন করোনা। ধর্মীয় মানসিকতা সম্পন্ন সব প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সবসময়ই এই প্রবণতা দেখা যায় যে মন ও দেহের অধিকার ও দাবী পূরণ করলে তা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী হয়ে পড়ে বলে তারা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে নিজেদেরকে প্রাণান্তকর কষ্টে নিক্ষেপ করা, স্বীয় হৃদয় মনকে বৈষয়িক স্বাদ- আস্বাদন থেকে বঞ্চিত করা এবং দুনিয়ার জীবন জীবিকার উপায় উপাদান ও দ্রব্য সামগ্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারাই হচ্ছে সত্যিকার পূন্যের কাজ। এটা না করলে তাদের মতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যেতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামের (রঃ) মধ্যেও এমনভাবের কিছু লোক বর্তমান ছিলেন। একবার রসুলে করিম (সঃ) জানতে পারলেন যে, কোন কোন সাহাবী (রাঃ) এজন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন যে - যখনই তাঁরা দিনের বেলায় রোযা রাখবেন, কখনো রোজা ভাংবেননা। কখনো রাতে শয্যা গ্রহণ করবেন না এবং সরারাত ইবাদত করবেন। স্ত্রীলোকদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না। এই কথা জেনে রাসূল করীম (সঃ) একটি ভাষণ প্রদান করলেন- তিনি তাঁদেরকে বললেন "আমাকে এধরনের কোন কাজের আদেশ করা হয়নি। তোমাদের দেহ মনের অধিকার আছে তোমাদের প্রতি, কাজেই কখনো রোজা রাখবে, কখনো পানাহার করবে (নফল) রাত্রের বেলায় কখনো

www.nagorikpathagar.org

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ় সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয় তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেনা। জেল, জুলুম, যখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা, বিদ্রুপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মী ও নেতাদেরও পদস্খলন ঘটে। একারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য বলেছেন যে, তারা কারো ভর্ৎসনার পরোয়া না করে স্বীয় জেহাদ অব্যাহত রাখবে। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন পালন করে চলার ও প্রতিষ্ঠা করার কাজে কারো বিরুদ্ধতা, কারো তিরস্কার, কারো আপত্তি, কারো বিদ্রুপ ও বিদ্বেষাত্মক কথা বার্তায় তারা কিছুমাত্র পরোয়া করেনা। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাস সমূহ আল্লাহ তা'আলারই দান। তিনি যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টা চরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারেনা। অতএব আমাদের কর্তব্য আল্লাহর কাছে এগুলো অর্জনের জন্য প্রার্থনা করা এবং সাথে সাথে চেষ্টা করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ، وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. ٥٧

হে মুমিনগণ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হও। সূরা (৫) মায়েদা ঃ আয়াত-৫৭

☆ ইতিপূর্বে সূরা আল ইমরানের ১১৮ নং আয়াত, সূরা নিসার ১৪৪ নং আয়াত এবং এই সূরারই ৫১ নং আয়াতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী, খ্রীষ্টানদেরকে এবং কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য নির্দেশ এবং এর সাথে সাথে কিছু কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। এবং পরবর্তী আয়াতেই আরো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে আমাদের নামাযের আহ্বান তথা আযানকে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এবং এর মাধ্যমে তাদের অন্তরেরর পুঞ্জিভূত ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অতএব এরপরও কিভাবে আমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারি? এই বাক্যে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে যদি কেউ আমাদের ধর্ম কর্ম নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে তবে সে যে-ই হোকনা কেন, আহলে কিতাব তথা ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা কাফির এমনকি বর্তমান সমাজের তথাকথিত প্রগতিবাদী যাদেরকে দুর্গতিবাদী বলাই সমীচিন যারা মুসলমান নামধারী হয়েও আযান নামাজ ইত্যাদি নিয়ে উপহাস করে তাদেরকে কিছুতেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবেনা এমনকি তাদের সংস্পর্শেও থাকা যাবেনা। যারা ধর্মকে বিদ্রুপ করে অথবা খেলাধূলা মনে করে তারা যদিও আমাদেরকে কখনো কখনো ধর্ম পালনে বাধা না

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস গ্রহণ করতে নিষেধ করছি।" হযরত ওমর (রাঃ) এই নীতিও হাদীসে উল্লেখ করেছেন "যে জিনিসের বেশী পরিমাণ নেশার উদ্রেক করে তার অল্প পরিমাণও হারাম।" হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) আরো বলেছেন "আল্লাহ তা'আয়ালা অভিশপ্ত করেছেন শরাবকে। মদ্যপায়ীকে, শরাব-সাবীকে, উহার বিক্রেতাকে, ক্রেতাকে, উৎপাদন শোধন কারীকে, উহা যে করায় তাকে, যে বহনকরে নিয়ে যায় তাকে এবং যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।" অপর এক হাদীসে রাসূল করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন "যে দস্তরখানে মদ পান করা হয় উহার উপর খাদ্য গ্রহণ করা নিষেধ।" রাসূল করীম (সঃ) মদ কাহাকেও উপহার দিতে (অমুসলিম) নিষেধ করেছেন, মদ থেকে সিরকা বানাতে নিষেধ করেছেন এমনকি তিনি বলেছেন "এটা ঔষধ নয় রোগ।" ইসলামের দৃষ্টিতে মদ হারামের এই আদেশকে কার্যকর করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে শামিল। ওমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে গোপনে মদ বিক্রয়কারী এক ব্যক্তির দোকান জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। এবং ব্যাপকভাবে মদ উৎপাদনকারী একটি গ্রামকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আদেশক্রমে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। যারা মদপানের বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারছিলনা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আদেশক্রমে জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। যারা মদপানের বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারছিলনা হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত এর শাস্তি দিতেন।

(২) জুয়া বলতে বুঝায় অতি সহজভাবে কোন কিছু লাভ করা বা কাজ না করেই লাভ ভোগ করা, অথবা যুক্তিসংগত কারণ ও অধিকার ছাড়া কোন কিছু বন্টন করা। যা মূলত আকস্মিক কোন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এটার বিভিন্ন ধরণ আছে যেমন- তাস, দাবা, ঘোড় দৌড় ইত্যাদি বিভিন্ন খেলাধুলা যেমন বর্তমানে ক্রিকেট খেলা নিয়ে খুব হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কেসিনো তথা জুয়ার আড্ডা, এতে হরেক রকম উপাদান এর মাধ্যমে কোন যুক্তি সংগত কারণ ছাড়াই লাভ বা ক্ষতি নির্ধারিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার লটারীও জুয়ার অন্যতম প্রধান একটা মাধ্যম। এগুলো সবই হারাম বলে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

(৪) চতুর্থ নম্বরে এই জুয়ারই একটা বিশেষ ধরণ তথা তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণের কথা উদাহরণ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। যেটা আধুনিক লটারী টিকেটের প্রাচীন সংস্করন। তৎকালে উট ইত্যাদি জবাই করে এই তীরের মাধ্যমে বন্টন করা হত এতে কেহ কিছুই পেতনা আবার কেহ একাধিক অংশ পেত। সেটাকে এখানে সুস্পষ্টরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে একটি ক্ষেত্রে লটারী জায়েয যেটাকে কোরায়া বলা হয়। যখন সকলের অধিকার সমান হয়, তখন সমঅধিকার ও বন্টনের ভিত্তিতে লটারী করা যেমন পৈত্রিক সম্পত্তি অথবা হাউজিং এর প্লট নির্ধারণ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সকলের অধিকার সমান জায়গাও সমান ভাগে ভাগ করে কে কোন ভাগটি

www.nagorikpathagar.org

ঘুমাবে আবার কখনো রাত্রি জাগরণ করবে। বিয়ে শাদীও করবে। আমাকেই দেখ, আমি রোজা রাখি আবার কখনো রাখিনা। রাতে জাগরুক থাকি আবার ঘুমাইও। বিয়েও করেছি। অতএব যে আমার নিয়ম নীতি পছন্দ করেনা সে আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়।" তিনি আরো বলেন - "এই লোকগুলোর কি হয়েছে তারা তাদের স্ত্রীদের, ভালখাদ্য, সুগন্ধি, নিদ্রা ও দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদনকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে। আমিতো তোমাদের কখনো এই শিক্ষা দেইনি যে তোমরা পাদ্রী পূরোহিত হবে। দুনিয়া ত্যাগ করবে। আমার প্রচারিত দ্বীন ইসলামে না নারী ও মাংস পরিহার করার নিয়ম আছে, না ঘরের কোনায় নিভৃত গহনে লুকিয়ে থাকার কোন শিক্ষা আছে। আত্মসংযমের জন্য এখানে রোজার ব্যবস্থা আছে দুনিয়া ত্যাগ ও বৈরাগ্যবাদের পরিবর্তে এখানে জিহাদ আছে।"

পরিশেষে আলোচ্য আয়াতে সীমালংঘন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সীমালংঘন ব্যাপক অর্থবোধক। হালালকে হারাম করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত পাক জিনিসকে নাপাক জিনিষের মত পরিহার করা মূলতই সীমালংঘন- অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। তাছাড়া পাক জিনিষ ব্যবহার ও ভোগ দখলেও সীমালংঘন হতে পারে। এবং হালালের সীমা অতিক্রম করে হারামের সীমায় প্রবেশ করাও সীমা লংঘন ও চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। এই তিনটি কাজই আল্লাহর অপছন্দনীয়। এবং এসবগুলো ক্ষেত্রেই আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا اِنَّمَاالْخَمْرُوَالْمَيْسِرُ
وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. ٩٠

হে মুমিনগণ! এই যে মদ (নেশা) জুয়া, স্তম্ভ (মূর্তি) লটারী (ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ) এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ, অতএব এগুলো পরিহার কর যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার। সূরা (৫) মায়েদা ঃ আয়াত-৯০

☆ আলোচ্য আয়াতে চারটি বস্তুকে চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে- (১) মদ (নেশা) (২) জুয়া (৩) পাথর, স্তম্ভ বা মূর্তি পূজা ও (৪) লটারী বা অসম বন্টন।

(১) মদ সম্পর্কে সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে এবং নিসার ৪৩ নং আয়াতে, সূরা নহল এর ৬০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে, কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ লাভের তুলনায় অনেক বেশী। সূরা নিসায় বলা হয়েছে মাতাল অবস্থায় নামাজের কাছেও যেওনা। অতঃপর এখানে চূড়ান্তভাবে হারাম করা হয়েছে। খামর বলতে মূলত আংগুর, খেজুর, যব, গম ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন মদ বুঝায়। কিন্তু রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী জিনিসই হারাম। আমি

www.nagorikpathagar.org

(প্লটটি) পাবে সেটা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। রাসূল (সঃ) যখন সফরে যেতেন তখন লটারী বা কোরায়ার মাধ্যমে স্ত্রীদের মধ্য থেকে সফর সংগী নির্ধারণ করতেন। যেহেতু সকল স্ত্রীর অধিকার সমান অতএব লটারীতে যার নাম উঠত তাঁকে নিয়ে যেতেন।

(৩) এই আয়াতে অপর যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সেটা স্তম্ভ বা পাথর পূজা। প্রাচীন আরবে এবং বর্তমান হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে যেমন দেখতে পাওয়া যায় কারো বা কোন কিছুর প্রতীক নির্মাণ করে সেখানে বিভিন্ন রকম খাদ্য দ্রব্য, ফল, ফুল এমনকি প্রাণীদেরকে উৎসর্গ করা হয় তথা পূজা করা হয়। এটার সকল প্রকার ও ধরণকে শয়তানের কাজ বলে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আমাদের মুসলমান নামধারীদের মাঝেও ভিন্নভাবে স্তম্ভ পূজার বিস্তার লাভ করেছে। যেমন বিশেষ বিশেষ দিনে অথবা বিশেষ কোন ঘটনা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কিছু ইট, পাথর ইত্যাদি জড় করে অথবা স্থায়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করে ফুল দেয়া শ্রদ্ধা জানানো এটা প্রকাশ্য পূজারই অনুরূপ একটা ব্যবস্থা মাত্র। মুমিনদেরকে অবশ্যই এব্যাপারে গভীর চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

বর্তমানে আমাদের সমাজে এই আয়াতে বর্ণিত চারটি হারাম কাজই অত্যন্ত ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। আমরা প্রত্যেকে এসব থেকে নিজে বিরত থাকা ও অপরকে বিরত রাখা উচিত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُه اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُه بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَه عَذَابٌ اَلِيْمٌ. ٩٤

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তোমাদেরকে এমন শিকার দ্বারা পরীক্ষা করবেন, যা সম্পূর্ণ রূপে তোমাদের করায়ত্ত ও বল্লমের পাল্লার মধ্যে হবে। ইহা দেখার জন্য যে কে আল্লাহকে অদৃশ্য অবস্থায় ভয় করে। এরূপ সাবধান বাণীর পরও যারা আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করবে তাদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আজাব রয়েছে। সূরা (৫) মায়েদা আয়াত-৯৪।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ

হে মুমিনগণ! তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার বধ করোনা। তোমাদের মধ্যে যে জেনে শুনে বধ করবে তার উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে। যা সমান হবে ঐ জন্তুর যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য

اَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ، عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْانْتِقَامٍ. ٩٥

ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে বিনিময়ে জন্তুটি কাবায় পৌছাতে হবে অথবা তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজেব কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোজা রাখবে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে তা আল্লাহ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। সূরা (৫) মায়েদা, আয়াত-৯৫।

☆ আলোচ্য ৯৪ এবং ৯৫ নং আয়াতে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৯৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে ইহরাম অবস্থায় আল্লাহ এমন সব শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন যেগুলো অত্যন্ত সহজ সাধ্য, লোভনীয় হাতের নাগালে এই অবস্থায়ও যাদের মনে আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকবে তারা অবশ্যই শিকার হতে বিরত থাকবে। আর ৯৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও যারা শিকার করবে তাদের উপর জরিমানা তথা কাফ্‌ফারা ধার্য করা হবে। এই কাফ্‌ফারা পর্যায়ক্রমে তিনটির একটি হবে। প্রথমত সমর্থ হলে সমপর্যায়ের একটি জন্তু কাবায় কুরবানী করতে হবে এবং এর গোস্ত গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। অথবা ঐ জন্তুর সমমূল্য দিয়ে গরীবদেরকে খাবার খাওয়াতে হবে অথবা অর্থ বিলিয়ে দিতে হবে অথবা উপরোক্ত কোনটাই সম্ভব না হলে যতজন গরীবকে খাওয়ানো যেত ততদিন রোজা রাখতে হবে। দু'জন ন্যায় বিচারক উপস্থিত ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের জন্তু অথবা এর অর্থমূল্য ঠিক করে দেবেন। এই কঠোর ব্যবস্থা এই জন্য যে, কেহ যেন আল্লাহর এই নিদর্শন ইহরামের অবমাননা না করে।

আল্লাহ বিস্তারিত ভাবে সতর্ক করে দিয়ে অতঃপর এর কাফ্‌ফারাও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তী আয়াতে পানিতে ভ্রমণকালীন ইহরামধারীদের জন্য মৎস শিকার হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে কোন কারণে সফর দীর্ঘায়িত হলে মৎস শিকার করে খাদ্যের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে। অতএব আমাদের উচিত যথাযথভাবে ইহরামের মর্যাদা রক্ষা করা।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ

হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করোনা যা তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দিলে তা তোমাদের পক্ষে অসহনীয় মনে হবে। কিন্তু তোমরা যদি সে

www.nagorikpathagar.org

الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ، عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ. ١٠١

বিষয়ে কুরআন নাযিল হওয়ার সময় জিজ্ঞাসা কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হবে। অতীত বিষয়ে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। সূরা (৫) মায়েদা, আয়াত-১০১।

☆ এমন অনেক বিষয় আছে যা সংগত কারণেই আমাদের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হলে আমাদের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ আমাদেরকে ততটুকুই বর্ণনা করেছেন যতটুকু মানলে আমাদের জন্য পালন করা সহজ হবে। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বুঝতে অক্ষম। এগুলোর পেছনে লেগে থাকা বোকামী। রাসূল (সাঃ) এর সময় কোন কোন সাহাবী (রাঃ) এমন ধরনের প্রশ্ন দুইবার তিনবার রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন প্রত্যেক বছরই কি হজ্জ ফরজ করা হয়েছে? তখন রাসূল (সাঃ) তাঁকে বললেন- তোমার জন্য আফসোস আমার মুখ থেকে যদি তোমার প্রশ্নের জবাবে হাঁ বের হত তবে প্রত্যেক বছরই হজ্জ করা ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তোমরাই তা পালন করতে সমর্থ হতে না। বরং ইহার নাফরমানী করা শুরু করে দিতে। এই ধরনের প্রশ্ন করতে আলোচ্য আয়াতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে রাসূল (সঃ) উল্লেখ করেছেন - "আল্লাহ্ তা'আলা কিছু ফরজ কাজ তোমাদের প্রতি ধার্য করেছেন তা নষ্ট করোনা, কিছু জিনিস হারাম করেছেন। সেগুলোর কাছেও যেওনা। কিছু সীমাও তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেগুলোও লংঘন করোনা। আর কতকগুলো জিনিস সম্পর্কে নির্বাক রয়েছেন। কিন্তু তিনি তা ভুলে যাননি কাজেই উহার খোঁজ করে বেড়িওনা। এখানে প্রসঙ্গত একথাও ইংগিত পাওয়া যায় যে আল্ কুরআন অবতরণ বন্ধ হলে নবুওয়ত ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। যাহা পরবর্তী ভন্ড নবীদের ভন্ডামী বন্ধ করার অন্যতম দলিল।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ، لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ، اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. ١٠٥

হে মুমিনগণ! তোমার নিজেদের সম্পর্কেই চিন্তা কর ঃ অপর কাহারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবেনা, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথের পথিক হয়ে থাকতে পার। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তিনি তখন তোমাদের বলে দেবেন যা কিছু তোমরা করতে। সূরা (৫) মায়েদা আয়াত ১০৫।

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে মানুষের সংশোধন কাজেও চিন্তায় নিমজ্জিত মুমিনদেরকে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ সত্য প্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতাকাংখার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্টতায়ই ডুবে থাকে তবে এর জন্য মোটেই চিন্তিত হইও না। এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবেনা। এই আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা কেহ কেহ মনে করতে পারেন যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের কথা চিন্তা করাই যথেষ্ট, অন্যরা যা ইচ্ছা করুক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এই বিষয়টি কুরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে ইসলামের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু সাহাবীর (রঃ) মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করেন। এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি সৎকাজের অদেশ দান' এর পরিপন্থী নয়, তোমরা যদি সৎকাজে আদেশ দান পরিত্যাগ কর তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। আলোচ্য আয়াতে তোমরা নিজের কথা চিন্তা কর এবং সৎপথের পথিক হয়ে থাক- এই অংশে জিহাদ ও সৎকাজে আদেশ দানও অন্তর্ভূক্ত। কারণ এই দুইটি বাদ দিলে নিজের কর্তব্য পূর্ণ হয়না এবং সৎপথেও থাকা হয়না। এগুলো করার পরও যদি কেই পথভ্রষ্ট থেকে যায় তবে তার জন্য সেই পাকড়াও হতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। বস্তুত মানুষ কেবল নিজের মুক্তির জন্য চিন্তা করবে অপর লোকদের সংশোধনের কোন চিন্তা করবেনা- এই কথা বলার জন্য এই আয়াত নাযিল হয়নি। এই আয়াতের বক্তব্যও তা'নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এই ভুল অপনোদন এবং উহার প্রতিবাদ করে একটি ভাষণ দান করেছেন - তিনি বলেছেন, "হে মানুষ তোমরা এই আয়াতটি পাঠ কর বটে কিন্তু উহার অর্থ ও তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ ভুল। আমি রাসূল করীম (সঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন - লোকদের অবস্থা যখন ততই খারাপ হয়ে যাবে যে, সে অন্যায় ও পাপ অনুষ্ঠিত হতে দেখবে কিন্তু উহা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করবেনা, জালিমকে দেখবে অত্যাচারের তান্ডব সৃষ্টি করতে কিন্তু হস্ত ধরে তাকে বিরত রাখবেনা, তখন খুব অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ সকলকেই তাঁর আযাবের বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত করে ফেলবেন। আল্লাহর শপথ ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ ও পাপ কাজের নিষেধ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর এমন সব লোককে শক্তিশালী করে বসিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও জঘন্য চরিত্রের। তারা তোমাদের উপর কঠোর দুঃখ কষ্টের অভিশাপ চাপিয়ে দেবে। তখন তোমাদের নেক লোকেরা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল করা হবেনা।

অতএব আমাদের উচিত নিজেরা সঠিক পথে থাকার চেষ্টা করার সাথে সাথে অন্যান্যদেরকেও সৎপথে আহ্বান এবং অসৎ পথ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা জারি রাখা। কিন্তু এচেষ্টায় অন্যরা সাড়া না দিলেও হতাশ না হয়ে নিজেরা সৎপথে অটল থাকা।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَاَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْاٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ، تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْكَانَ ذَاقُرْبٰى، وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّااِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ. ١٠٦

হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী অথবা তোমাদের বাহির থেকে রাখ। যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদের মৃত্যুর কঠিন সময় উপস্থিত হয়। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। উভয়কে নামাজের পর আটকে রাখ, অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে আমরা এই কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাইনা, যদিও কোন আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করবনা। আমরা যদি তা করি তাহলে কঠোর গুনাহগার হব। সূরা (৫) মায়িদা ঃ আয়াত -১০৬

☆ আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,কারো মৃত্যুর সময় অসিয়ত করতে চাইলে দু'জন ন্যায়পরায়ন সাক্ষী মুসলমানদের মধ্য থেকে রাখতে হবে। আর যদি মুসলমানদের মধ্য থেকে সাক্ষী না পাওয়া যায়, যেমন প্রবাসে, তাহলে অমুসলিমদের থেকেও সাক্ষী রাখা যাবে। আর সাক্ষীদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে নামাজের পর তাদেরকে কসম খেতে বলা হবে যাতে তারা আল্লাহর ভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকে।

অসিয়ত সম্পর্কে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সূরা নিসার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর অসিয়াত করার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে কেউ চাইলে উত্তরাধিকারীর বন্টনের সময় যদি কোন ঋণ থাকে তা পরিশোধ করার পর অসিয়ত কার্যকর করার পর সম্পদ সম্পত্তি বন্টন করা হবে। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে যাদেরকে শরীয়ত উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করেছে তাদের নামে কোন অসিয়ত করা যাবেনা।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ. ١٥

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে (যুদ্ধে) মুখোমুখি হও তখন পলায়ন করবে না। সূরা (৮) আনফাল, আয়াত-১৫।

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে এবং এর পরবর্তী আয়াতে যুদ্ধের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। অত্র আয়াতে 'জাহফ্যন' শব্দ দ্বারা পরিকল্পিত প্রস্তুতি নিয়ে দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করা বুঝায়। যখন পরস্পর মুখোমুখি হবে তখন পলায়ন করার অনুমতি নেই। হয় বিজয় অথবা মৃত্যু তথা শাহাদাৎ। রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন- তিনটি গুনাহ্ এমন সাংঘাতিক যে, তা করলে কোন নেক কাজই কোন ফায়দা দিতে পারেনা। (১) শিরক (২) পিতা-মাতার হক নষ্ট করা ও (৩) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। এটা শুধুমাত্র কাপুরুষোচিত এবং গুনাহের কাজই নয় বরং এক ব্যক্তির পলায়ন একটি বাহিনীর মধ্যে এবং একটি বাহিনীর পলায়ন সমগ্র বাহিনীর মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির কারণ হতে পারে। ফলে গোটা বাহিনী, দেশ ও জাতির চরম পরাজয় নেমে আসতে পারে।

পরবর্তী আয়াতে দুটি ক্ষেত্রে পশ্চাদাপসরণ এর অনুমতি রয়েছে পলায়নের নয়। (১) কিছুটা পিছু হটে পুনরায় শক্তিশালী আক্রমণ করার জন্য অথবা শত্রু পক্ষকে ধোকা দেয়ার জন্য বা বোকা বানানোর জন্য। (২) এক বা কতক সৈন্য মূল বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গেলে তাদের সাথে একত্রিত হওয়ার জন্য।

মূল কথা প্রত্যেকেই নিজের জীবন ও সম্পদকে সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য নিয়োগ করতে হবে। এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবেনা যাতে নিজ বাহিনীর মধ্যে ভয়, ভীতি বা ত্রাসের সৃষ্টি হয়। বরং সর্বাবস্থায় জান কুরবান করে হলেও বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ. ٢٠

হে মুমিনগণ! আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং আদেশ শুনার পর অমান্য করোনা। সূরা আনফাল আয়াত-২০।

☆ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে- যখনই আমরা জানতে পারব ঈমানের অপরিহার্য দাবী এই যে- আমাদের পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, আমরা এর উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি বা না পারি। এটা সহজ সাধ্য কিংবা দুঃসাধ্য, আপাতঃ দৃষ্টিতে উপকারী বা অপকারী যা-ই হোক না কেন তার সামনে আমাদের আনুগত্যের মস্তক অবনত করা এবং সর্বাত্মক ভাবে এটা পালন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এটা পালন করার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে এটা আল্লাহর হুকুম এবং আল্লাহর রাসূলের হুকুম। অবশ্য আমরা যদি সত্যিকার বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী হই তবে অবশ্যই আমরা দেখতে পাব আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সকল হুকুমই অত্যন্ত যুক্তি সংগত, অত্যন্ত উপকারী এবং পরিণামের দিক দিয়ে এগুলো তুলনাহীন কল্যাণ বহন করে। অতএব

www.nagorikpathagar.org

আমাদের উচিত আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতিটি নির্দেশ শুনার পর তা যথাযথ বাস্তবায়ন করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ، وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ. ٢٤

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও। যখন রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে ডাকেন সে জিনিসের দিকে যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে। আর জেনে রাখ আল্লাহ ব্যক্তি ও তার দিলের মধ্যে অন্তরায় এবং তার দিকেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। সূরা (৮) আনফাল ঃ আয়াত-২৪।

☆ আলোচ্য আয়াতে একটি বিষয় লক্ষনীয়- প্রথমে বলা হয়েছে আল্লাহ ও রাসূলের (সঃ) ডাকে সাড়া দাও। পরবর্তীতে একবচনে শুধু রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে ডাকেন বলা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) যা কিছু বলেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই বলেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাঁর ইচ্ছাকে সর্বতোভাবে আল্লাহর উপর সোপর্দ করেন। অতঃপর আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে জীবন ও কাজের মাধ্যমে রাসূল (সঃ) এর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য। কারণ এটাই আমাদেরকে প্রকৃত জীবনের সন্ধান দেয়। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে এতে আমাদের বৈষয়িক জীবনের ও সম্পদের ক্ষয় ক্ষতি মনে হতে পারে।

যদি আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া না দেই তবে ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে যায় না। আল্লাহ অবশ্যই আমাদের থেকে এর হিসেব নেবেন। সাড়া দিতে অস্বীকৃতি আমাদের কোন বৈষয়িক স্বার্থ আল্লাহর জন্য বিসর্জন দিতে অপারগতার জন্যই হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ডাকে সাড়া না দিয়ে আমরা কি আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারি? কখনো না। কারণ আমাদের ইচ্ছাই যথেষ্ট নয় আল্লাহর অনুমোদন প্রয়োজন। যদিও আমাদের পরিকল্পনা অন্য কেহ না জানুক কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই জানেন। পরিশেষে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে।

এই আয়াতটি মূলত আমাদেরকে মুনাফেকী আচরণ থেকে বিরত রাখে। কারণ আলোচ্য আয়াত দুটি বিষয় আমাদেরকে সুস্পষ্ট করে দেয়- (১) সমস্ত ব্যাপারে কর্তৃত্ব সেই আল্লাহর হস্তে নিবদ্ধ যিনি সকলের মনের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রয়েছেন। যিনি সকল গোপন তথ্য ও তত্ব এমনভাবে জানেন যে, ব্যক্তির নিজের মনে যেসব ইচ্ছা বাসনা, যে লালসা কামনা, যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং যেসব চিন্তা বিশ্বাস লুকায়িত রয়েছে তা সবই তাঁর নিকট সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত। (২) শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকটই ফিরে

www.nagorikpathagar.org

যেতে হবে। তাঁর নিকট না যেয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এই দুইটি বিষয় যখন আমাদের মনে বদ্ধমূল হবে তখন মুনাফেকী আমাদের মনে কিছুতেই ঠাঁই পেতে পারেনা। যার অন্তরে এই বিশ্বাস যত দৃঢ়মূল হবে মুনাফেকী তার থেকে ততই বিদুরীত হবে, পালিয়ে যাবে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. ٢٧

হে মুমিনগণ! জেনেশুনে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) সাথে বিশ্বাস ভংগ করোনা এবং নিজেদের আমানতের ব্যাপারে বিশ্বাস ভংগ করোনা। সূরা (৮) আনফাল, আয়াত-২৭।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য আমানতদারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই আমানতদারী তিন প্রকার। (১) আল্লাহর আমানত (২) আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আমানত ও (৩) পারস্পরিক আমানত। এখানে এই তিনটি আমানতেরই খেয়ানত করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর বস্তুগত দিক থেকেও এই আমানত সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যায় (ক) সম্পদ ও বস্তুগত উপকরণ (খ) পরিকল্পনা ও গোপনীয় বিষয় সমূহ (গ) জ্ঞান যোগ্যতা ও সুযোগ।

মানুষ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর আমানতগুলো বিভিন্নভাবে খেয়ানত করে- সম্পদের অপব্যবহার, পরিকল্পনা ও গোপনীয়তা নষ্ট করে এবং নিজের যোগ্যতা জ্ঞান ও সামর্থকে যথাযথ কাজে না লাগিয়ে বিশেষত যখন মুসলিম সমাজ বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র ও আক্রমনের শিকার তখন এই সমস্ত আমানত যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণ ও ব্যবহার অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। আর আমাদের পারস্পরিক আমানত সমূহ প্রতিদিনই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আমরা কি এটা দাবী করতে পারি যে পারস্পরিক আমানত সমূহ খেয়ানত হচ্ছে না? আল্লাহর কাছে আমরা এগুলোর কি জবাব দেবো?

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ. ٢٩

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে মানদন্ড দান করবেন। তোমাদের দোষ-ত্রুটি দুর করবেন, আর তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। বস্তুত আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। সূরা (৮) আনফাল, আয়াত-২৯।

☆ আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে- যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে যাবতীয় পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর মহব্বত ও আনুগত্যকে

www.nagorikpathagar.org

সবকিছুর উর্ধ্বে স্থাপন করবে যাকে শরীয়াতের পরিভাষায় ও কুরআনে 'তাকওয়া' বলা হয় তাহলে সে তিনটি প্রতিদান লাভ করবে। (১) ফুরকান (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও (৩) মাগফিরাত বা পরিত্রাণ।

৮পরিভাষাগত ভাবে ফুরকান এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দুটি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ঠ পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে। এক কথায় মানদন্ড শব্দ দ্বারা এটা বুঝা যায়। এটা ভাল ও মন্দ। প্রকৃত ও অপ্রকৃত। খাঁটি ও অখাঁটির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তোলে। এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে আমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকি এবং আল্লাহর সন্তোষ বিরোধী কোন কাজ আমাদের দ্বারা না হউক এটা চাই তাহলে আল্লাহ পাক আমাদের মধ্যে পার্থক্যকারী একটা শক্তি যেটাকে ইলহামও বলা যেতে পারে উদ্ভব করে দেবেন। এর আলোকে আমরা প্রতি পদে পদে জানতে পারব বুঝতে পারব কোন আচরণ ও নীতি সঠিক, নির্ভুল ও নির্দোষ আর কোনটি ভুল ও ক্রটি পূর্ণ। আল্লাহ্ কোন কাজে সন্তুষ্ট আর কিসে তিনি অসন্তুষ্ট, জীবনের প্রতিটি বাঁকে প্রতিটি চড়াই, উৎরাইয়ে কি করা উচিত কি না করা উচিত। কোন পথ সত্যমুখী ও আল্লাহ্‌র দিকে চালিত। কোনটি বাতিল ও অন্যায় এবং শয়তানের দিকে চালিত তা আমরা স্পষ্ট জানতে পারব। এই কুরআনের অপর একটি নামও ফুরকান। অর্থাৎ আমরা যদি যথার্থ ভাবে তাকওয়া অবলম্বন করি বা আল্লাহর সন্তোষ চাই আল্লাহকে ভয় করি তাহলেই এই কুরআন থেকে আমরা সত্য-মিথ্যা, কোনটা করা উচিত কোনটা করা উচিত নয় সেই হেদায়াত অর্জন করতে পারব।

(২) অপর যে প্রাপ্য তাহলো আমাদের পাপের মোচন। অর্থাৎ যেসব ক্রটি বিচ্যুতি আমাদের হয়ে গেছে সেগুলোর কাফফারা ও বালার ব্যবস্থা এই দুনিয়াতেই হয়ে যায়। অর্থাৎ এমন সৎকর্ম সম্পাদনের তৌফিক হবে যা আমাদের সমুদয় ক্রটি বিচ্যুতির উপর প্রবল হবে।

(৩) তাকওয়ার সর্বশেষ পুরষ্কার যেটা তাহল যাবতীয় পাপের ক্ষমা লাভ এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ।

অতএব আমাদেরকে চূড়ান্ত কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে একমাত্র তাকওয়া এবং যথার্থ তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. ٤٥

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর মুকাবিলা করবে তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার। সূরা (৮) আনফাল, আয়াত-৪৫।

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক মুমিনদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শত্রুর মুকাবিলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়াত নামা দান করেছেন। যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনে কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্য এতেই নিহিত ছিল।

প্রথমত দৃঢ়তা অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা, স্থির ও অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা এবং সংকল্পের অটলতা উভয়টি এর অন্তর্ভূক্ত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে কার্যকর অস্ত্র হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায় উপকরণই বেকার।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর যিকির ঃ এটা সেই বিশেষ হাতিয়ার যার অধিকারী একমাত্র মুমিনেরা। ইতিহাস সাক্ষী এই অস্ত্রের মুকাবিলা বিরোধীরা কখনো কোথাও সফলভাবে করতে পারেনি। আল্লাহর যিকিরে নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ আছে তাতো যথাস্থানে আছেই তদুপরি এটাও বাস্তব সত্য যে দৃঢ়তার জন্য এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক শক্তি যা একজন দূর্বলতম মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মুকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিপদ যত কঠিনই হোকনা কেন আল্লাহর স্মরণ সে সমস্তকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন - মানষকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে।

কুরআন করীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুমিনকে আল্লাহর স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকিদসহ।

এখানে এবিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, সমগ্র কুরআনে আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহর যিকির তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম, এবং নাইবা অন্য কোন কাজের কোনরকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহর যিকিরের জন্য কোন শর্তা-শর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা অযু কিংবা পবিত্রতা, পোষাক আষাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় অযুর সাথে, বিনা অযুতে, দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে।

ইমাম জাযারী তার হিসনে হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর যিকির শুধু মুখে কিংবা মনে মনে করাকেই বলা হয়না রবং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) এর অনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে তাও জিকরুল্লাহর অন্তর্ভূক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করার নির্দেশটিকে যদিও বাহ্যিকভাবে মুজাহেদিনদের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেয়া হল বলে মনে হয় যা স্বভাবতই কষ্ট ও পরিশ্রম সাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর যিকিরের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে তাতে

www.nagorikpathagar.org

কখনো কোন পরিশ্রম তো হয়ইনা বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজকর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্টকর পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গাণের কলি কাজের ফাঁকে গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকে। সুতরাং কুরআনে করীম মুসলমানদেরকে তার একটা উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা এবং তাৎপর্য মন্ডিত।

পরবর্তী দুটি বাক্যে যুদ্ধে সাফল্যের জন্য অন্যান্য শর্তাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- (১) আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর নির্দেশ মান্য করা। (২) পরস্পর বিবাদে লিপ্ত না হওয়া (৩) ধৈর্য ধারণ করা এবং (৪) অহংকার না করা ইত্যাদি।

অতএব আমাদের উচিত যুদ্ধ কিংবা শান্তি সর্বাবস্থায় শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ، وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. ٢٣

হে মুমিনগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবক রূপে গ্রহণ করোনা, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারাই জালেম। সূরা (৯) তাওবা-আয়াত - ২৩

☆ আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কারো পিতা অথবা ভাই ঈমান অপেক্ষা কুফরকে অধিক ভালবাসে তবে তাদেরকে "অলি" অর্থাৎ অভিভাবক, সাথী বা বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যাবেনা। কারণ মুমিনের কাছে তার ঈমান যাবতীয় সম্পর্কের চাইতে অগ্রাধিকার পাবে। যে-ই তার ঈমানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ঈমানের দাবী পূরণ করতে হবে। এবং বলা হয়েছে যদি কেহ "মুমিন" দাবী করা সত্ত্বেও এধরনের কাউকে বন্ধু বা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তবে সে জালিম বা সীমা লংঘনকারী তথা ঈমানের দাবীতে মিথ্যাবাদী। পরবর্তী আয়াতে এবিষয়টি আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে পুত্র, স্ত্রী আত্মীয় স্বজন যেই হোকনা কেন তাদের সাথেও সম্পর্ক ঈমানের ভিত্তিতেই নিরূপিত হবে। আল্ কুরআনের সূরা আনকাবুতের ৮নং আয়াতে এবং সূরা লোকমানের ১৪-১৫নং আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহর পর পিতা-মাতার অধিকার সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তারাও যদি কুফরীর দিকে ডাকে তবে তাদের কথা শুনা যাবেনা। অবশ্য তাদের সাথে যতটুকু সম্ভব ভালো ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাহাবীরা (রাঃ) এই আয়াতের প্রতিফলন করে দেখিয়ে দিয়েছেন বদর যুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে। ভাগ্নে মামার

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে, ভাতিজা চাচার বিরুদ্ধে শুধু মাত্র ঈমানের খাতিরে যুদ্ধ করেছেন, এমনকি হত্যা করেছেন।

হাদীসে রাসূল করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন "কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারেনা যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা সন্তান-সন্তুতি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই" (বুখারী ও মুসলিম)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো ইরশাদ করেছেন যে, "যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব করেছে শুধু আল্লাহর জন্য, শত্রুতা করেছে শুধু আল্লাহর জন্য, খাইয়েছে শুধু আল্লাহর জন্য এবং খাওয়া থেকে বিরত থেকেছে আল্লাহর জন্য সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।" হাদীসের এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ভালোবাসাকে অপরাপর ভালোবাসার উর্ধ্বে স্থান দেয়া এবং শত্রুতায় ও মিত্রতায় আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের অনুগত থাকা ঈমানের পূর্ণতা লাভের পূর্বশর্ত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا، وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ، اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. ٢٨

হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। অতএব এই বৎসরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটেও না আসতে পারে। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে ভবিষ্যতে তোমাদের অভাব মুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা (৯) তাওবা, আয়াত-২৮।

☆ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহপাক ৯ম হিজরীর পর থেকে মক্কা শরীফে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার রহিত করে দিলেন এবং কারণ স্বরূপ বললেন যে তারা নাপাক। মূলত তাদের নাপাকি বাহ্যিক ও নৈতিক- তথা চরিত্র ও কর্ম সকল দিক দিয়ে। বাহ্যিকভাবে তারা নাপাক কারণ তারা যথানিয়মে ওযু গোসল ইত্যাদি করেনা। আর তাদের আকিদা বিশ্বাস, আমল-আখলাক, চরিত্র ও জীবন ধারা-পদ্ধতি এই সবই নাপাক। তাদেরকে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল মুসলিমদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদাত হজ্জকে সর্বপ্রকার জাহেলিয়াত থেকে মুক্ত করার জন্য। এবং মুসলমানদের এই কেন্দ্রভূমিকে সর্বপ্রকার অপবিত্রতা থেকে হেফাযত করার জন্য আল্লাহ পাক এখানে আরো সতর্ক করে দিলেন যে, ধন সম্পদ আল্লাহর হাতে। অমুসলিমদের সাহায্য ছাড়াই আল্লাহ চাইলে মুসলিম দিগকে সম্পদশালী করে দেবেন। অতএব তাদেরকে বিতাড়িত করতে আর্থিক অনটনের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের উচিত ইসলামের হুকুম পালনে কারো পরোয়া না করে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করেই অগ্রসর হওয়া।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ. ٣٤

হে মুমিনগণ! (এই আহলি কিতাবের) অধিকাংশ আলিম দরবেশরাই লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখে। আর যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সূরা (৯) তাওবা, আয়াত-৩৪।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে ইহুদী ও খ্রীস্টান পাদ্রী পুরোহিতদের এমন সব কুকীর্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা লোক সমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী খ্রীস্টানদের আলোচনায় মুসলমানদেরকে সম্বোধন করার তাৎপর্য হচ্ছে- মুসলমানদেরকে সতর্ক করা যাতে তাদের অবস্থাও অনুরূপ অধঃপতিত না হয়। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু বলা হয়েছে যে তারা অন্যায় পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগ করে। বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা ঘুষ, হাদিয়া-তোহফার বিনিময়ে ভুল ফতোয়া দেয়, যেটা দিলে লোকজন খুশী হবে সেটাই দেয়, এজন্য তারা ধর্মীয় বিধান ইচ্ছামত পরিবর্তন করে। তাছাড়া তারা এমন সব রীতি-নীতি ও আইন কানুন উদ্ভাবন করে যার ফলে লোকজন নিজেদের পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে তাদেরকে অঢেল অর্থ সম্পদ দিতে বাধ্য হয়। তাদের হীন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে দুনিয়ার মানুষকে নিজেদের গোমরাহীর দুঃচ্ছেদ্য জালে বন্ধী করে এমনকি যখন সমাজ সংশোধন ও সত্যিকার ধর্মীয় বিধান কায়েমের কোন চেষ্টা শুরু হয় তখন তারাই সর্ব প্রথম নিজেদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধোঁকাবাজী ও কূটকৌশলের হাতিয়ার নিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সৃষ্টি করে। পরিণামে তারা নিজেরাতো গোমরাহ থাকেই সমাজের মধ্যে গোমরাহীর এক স্থায়ী উৎসে পরিণত হয় এবং সাধারণ জনগণকে চরমভাবে গোমরাহ করে। আফসোস যদিও এব্যাপারে বহুপূর্বেই কুরআন মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আল্ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তৎকালীন ইহুদী খৃষ্টান আলেমরা যে ভূমিকায় ছিল আমাদের মুসলিম সমাজেও আজ অনেক আলেম ও পীর একই ভূমিকা অবলম্বন করছে।

মূলতঃ এই ভূমিকার অন্যতম কারণ অর্থের লোভ-লালসা। তাই আয়াতের পরবর্তী অংশে এই লোভ লালসা দুর করার জন্য অর্থ লিপ্সার করুণ পরিণতি ও কঠোর সাজা

www.nagorikpathagar.org

এবং ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য বলা হয়েছে সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য। হাদীস শরীফে রাসূল করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন "যে মালের যাকাত দেয়া হয় তা জমা রাখা সঞ্চিত ধনরত্নের শামিল নয়।" (আবু দাউদ, আহমদ) এ থেকে বুঝা যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে তা জমা রাখা গুনাহ্ নয়।

অতএব আমাদের উচিত কোন ভন্ড বা প্রতারক আলেমের কথায় কর্ণপাত না করে সত্যিকার আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া এবং কুরআন ওহাদীসের সাথে তাদের কথা ও কাজকে মিলিয়ে নেয়া, সম্পদের যথাযথ যাকাত আদায় করা ও আল্লাহর দ্বীনের পথে সম্পদ ব্যয় করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ، اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ. ٣٨

হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্য বলা হয় তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। সূরা (৯) তাওবা আয়াত -৩৮

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনের জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক রোগটি অত্যন্ত সুন্দর উপমার সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতটি তাবুক যুদ্ধকালীন সময়ে নাযিল হয়েছে। তখন সময় ছিল অত্যন্ত নাজুক, গ্রীষ্মের প্রচন্ডতম গরম, সফর ছিল অত্যন্ত কষ্টকর ও দূরের পথ, প্রতিপক্ষ ছিল তৎকালীন সময়ের একমাত্র সুপার পাওয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত রোমান শক্তি এবং একমাত্র ফসল খেজুর ঘরে তোলার সময় এই সমস্ত ভয় ও প্রলোভন জয় করে কোন কোন সাহাবী (রাঃ) জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হননি। তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে তোমরা কেন মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে আছ? তোমরা কি দুনিয়ার এই নগণ্য সম্পদ এবং ক্ষুদ্র জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছ? কিন্তু পরকালের তুলনায় দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ এবং দীর্ঘতম আয়ুর মানুষের জীবনও কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা এবং সকল অপরাধ বা গুনাহর মূল কারণ হল দুনিয়া প্রীতি ও আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে - "দুনিয়ার মোহ সকল গুনাহর মূল।" এই রোগ দূর করার জন্যই পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদও পরকালের তুলনায় অত্যন্ত নগন্য। প্রকৃতপক্ষে যখনই আমাদের মনে আখিরাতের বিশ্বাস বদ্ধমূল হবে যখন দুনিয়ার সমস্ত অসুবিধা বিপদ

www.nagorikpathagar.org

মুসিবত অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হবে। দুনিয়ার সমস্ত অর্থ সম্পদ ভোগের উপকরণ নগণ্য মনে হবে। ফলে আমরা নির্দ্ধিধায় জেহাদে এবং সকল ধর্মীয় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব। মূল কথা দুনিয়ার মোহ সকল রোগের মূল আর পরকালের চিন্তা সকল রোগের মহৌষধ।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ. ١١٩

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে থাক। সূরা (৯) তাওবা ঃ আয়াত-১১৯

☆ আলোচ্য আয়াতে সাধারণভাবেই বুঝা যায় আল্লাহকে ভয় করার এবং সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমরা যদি পূর্ববর্তী আয়াতের দিকে তাকাই তাহলে এ আয়াতের তাৎপর্য আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। পূর্ববর্তী আয়াতে জিহাদ থেকে বিরত থাকায় তিনজন সাহাবীকে (রাঃ) তাঁদের অপরাধ স্বীকারের পুরস্কার হিসেবে ন্যূনতম শাস্তি আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছিল এবং অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে ক্ষমা করার ঘোষণা এই দুনিয়াতেই দেয়া হয়েছিল। তাঁদের এই মহা পুরস্কার হিসেবে দুনিয়াতেই ক্ষমা লাভের ঘোষণা আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছিল কেবল মাত্র তাঁদের তাকওয়া তথা আল্লাহ ভীতির কারণে। তাই এই আয়াতে মুমিনদেরকে আল্লাহ ভীতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই বাক্যে আমরা এমন ইংগিত পাই এবং ঘটনার শানে নযুলও এটাই প্রমাণ করে যে সত্যনিষ্ঠদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভে সহায়ক হয়। এখানে এমন ইংগিতও রয়েছে যে মুনাফিকদের সাথে উঠা বসা এবং তাদের পরামর্শের কারণেই এই তিনজন মহান সাহাবীর পদস্খলন হয়েছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই বাক্যে আলেম ও সালেহীনের পরিবর্তে "সাদেকীন" ব্যবহার করে আলেম ও সালেহীনের প্রকৃত পরিচয় দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই যথার্থ আলেম ও সালেহীন বা নেককার যিনি ভিতরে ও বাহিরে সমান এবং নিয়ত ও কর্মে ইচ্ছায়, কথা ও কর্মে, জ্ঞানে ও আমলে সব সময় সত্যপন্থী হন। এককথায় একে আমরা "সত্যনিষ্ঠ" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। অতএব আমাদেরকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে। এবং সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকতে হবে।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً، وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ. ١٢٣

হে মুমিনগণ! যুদ্ধ কর সেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের নিকটবর্তী রয়েছে। তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের সাথে রয়েছেন। সূরা (৯) তাওবা,আয়াত-১২৩।

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে যুদ্ধ শুরু করার পদ্ধতি বলা হয়েছে। কাফেররা তো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করতে হবে? এ আয়াতে বলা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী তাদের সাথে প্রথমে যুদ্ধ করতে হবে। নির্দেশ দেয়া হয়েছে আগে এদের সাথেই যুদ্ধ কর। কারণ ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী যুদ্ধ জিহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয় স্বজন অগ্রগন্য। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে- "হে রাসূল (সঃ) নিজের আত্মীয় স্বজন এবং নিকটবর্তীদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন (সূরা শুয়ারা-২১৪ নং আয়াত)। তাই তিনি এই আদেশ প্রতিপালনে সর্বপ্রথম স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহর আদেশ শুনিয়ে দেন। অনুরূপভাবে তিনি স্থান হিসেবে প্রথমে মদিনার আশে পাশের কাফের তথা বনু কুরাইয়া, বনু নসীর, খয়বর বাসীদের সাথে মুকাবিলা করেন। সর্বশেষে দুরবর্তী তথা রোমানদের সাথে মুকাবিলা করেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায় এখানে মুনফিকদেরকেই কাফের বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা তাদের কথা ও কাজে সত্যদ্বীন অমান্য করার ব্যাপারটি পূর্ণমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং ইসলামী সমাজে মিলে মিশে থাকার কারণে তাদের দ্বারা খুব বেশী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

অতঃপর বলা হয়েছে তারা যেন তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা দেখতে পায়। অর্থাৎ এতদিন তাদের সাথে যে নরম ব্যবহার করা হচ্ছিল এখন এর অবসান ঘটাতে হবে। পরিশেষে তাকওয়া অবলম্বনের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। এর দু'টি দিক রয়েছে একটি এই যে এই সত্যের দুশমন লোকদের ব্যাপারে তোমরা যদি ব্যক্তিগত পারিবারিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দাও তবে তাহা নিশ্চয়ই তাকওয়ার বিপরীত আচরণ হবে। কেননা মুত্তাকী হওয়া এবং একই সঙ্গে আল্লাহর দুশমনদের সাথে মনের সম্পর্ক বজায় রাখা উভয়ই পরস্পর বিরোধী আচরণ। কাজেই আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হতে হলে এই মত বিরোধীদের প্রতি মনের দুর্বলতা ও ঝোঁক প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে হবে।

দ্বিতীয়ত এখানে কঠোরতা ও যুদ্ধ করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, তাদের প্রতি কঠোর আচরণের ব্যাপারে নৈতিকতা, মনুষ্যত্ব ও মানবতার সীমাকেও লংঘন করে যেতে হবে। না তা বরং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকে সকল অবস্থাতেই সকল কাজে ও ব্যাপারে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। তোমরা যদি উহাকেই পরিহার কর তবে পরিণামে আল্লাহও তোমাদের সংগ ত্যাগ করবেন এব্যাপারে সূরা মায়েদার ৮নং আয়াতে বলা হয়েছে "কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করোনা, সুবিচার কর। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।"

অতএব কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে এবং এতে কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু সবসময়ই তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. ٧٧

হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা (২২) হজ্জ ঃ আয়াত - ৭৭

☆ আমরা সকলেই কল্যাণ লাভ করতে চাই। কিন্তু এটা প্রাপ্তির উপায় কি? সেটাই আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কল্যাণ লাভ করতে হলে আমাদেরকে রুকু সেজদা করতে হবে অর্থাৎ নামাজ আদায় করতে হবে, আল্লাহর এবাদত বন্দেগী করতে হবে এবং শুধু এতটুকুতেই শেষ নয় সৎকাজও করতে হবে। মূলত মানুষকে আল্লাহপাক সৃষ্টিই করেছেন তাঁর ইবাদত বন্দেগী করার জন্য কিন্তু তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন যাতে সে যথার্থ ইবাদত করে কিনা এবং এক্ষেত্রেই মানুষ চূড়ান্ত পরীক্ষার সম্মুখীন। আর আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের (সঃ) সুন্নাহ ভিত্তিক সকল কাজই ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত। তথাপিও আলোচ্য আয়াতে রুকু সিজতা তথা নামাজ, সৎকাজ এবং ইবাদাত তিনটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত নামাজ ও সৎকাজ অবশ্যই ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য ইবাদাতের পাশাপাশি নামাজ ও সৎকাজকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ নামাজ ইবাদাত সমূহের মধ্যে সর্ব প্রধান ইবাদত। আল্লাহর ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পূর্ণ কুরআন শরীফে ও হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। ঠিক যেভাবে করতে বলা হয়েছে সেভাবেই ইবাদাত করতে হবে। কিভাবে কোন কাজ করলে ইবাদাত হবে। প্রতিটি কাজে কুরআন ও হাদীস থেকে জেনে নিয়ে সেভাবেই করতে হবে। অন্যথায় ইবাদাতের পরিবর্তে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করেছে। অনুরূপভাবে সৎকাজগুলোর বর্ণনাও কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। এছাড়াও আমাদের অন্তরও এটা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে শুধু অন্তরের সায় দেয়াতেই চলবেনা, কাজগুলো কুরআন ও হাদীসের নীতি বিরোধী হতে পারবেনা। কোনরূপ কল্যাণ লাভের আশা যদি করা যায় তবে এরূপ আচরণ গ্রহণ করার ফলেই করা যায়। কিন্তু যে লোকই এরূপ আচরণ গ্রহণ করবে তার আমল সম্পর্কে কোনরূপ অহংকার থাকা উচিত নয়। কেহ যদি মনে করে আমি যখন এরূপ এবাদাতকারী, এতদূর নেককার তখন অবশ্যই কল্যাল লাভ করব। তবে তা মারাত্মক ভুল হবে। তারতো আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের জন্য আশাবাদী হওয়া উচিত। তিনি কল্যাণ দিলেই তবে কাহারো পক্ষে তা পাওয়া সম্ভব হতে পারে। নিজস্ব শক্তিবলে কল্যাণ লাভ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ব নয়।

(এই আয়াতটি তেলাওয়াত-ই সেজদার আয়াত। অর্থাৎ আয়াতটি তেলাওয়াত করে

www.nagorikpathagar.org

সাথে সাথে সেজদা করা অবশ্য কর্তব্য। যদিও এটাতে ইমামদের মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়। তবে নিরাপদ অবস্থানে থাকা জন্য সেজদা করাটাই উত্তম।)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ، وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّه يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه مَازَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا، وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ، وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. ٢١

হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সেতো তাহাকে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজের আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত তবে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন, আল্লাহ সবকিছু শোনেন। জানেন। সূরা (২৪) নূর ঃ আয়াত ঃ ২১

☆ আলোচ্য আয়াতে শয়তানের চক্রান্ত তথা শয়তানী সম্পর্কে মুমিনদেরকে শতর্ক করে দেয়া হয়েছে। শয়তানের কাজতো মুমিনদের বিরুদ্ধে অপবাদ, দুর্নাম এবং মিথ্যাচারের মাধ্যমে চারিত্রিক কলংক লেপন করা। এবং তার একমাত্র কামনা বাসনা সমাজে নির্লজ্জতা ও খারাপ কাজের প্রসার ঘটুক। অত্র আয়াতের পূর্বের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করলে এ আয়াতটি আরো ভালোভাবে বুঝা যাবে। যেখানে শয়তানের প্ররোচনায় স্বয়ং মা আয়েশার (রাঃ) বিরুদ্ধে অপবাদ ও দুর্নাম রটনা করা হচ্ছিল, এমনকি কোন কোন মুমিনও একাজে জড়িয়ে পড়ছিল। তাই এখানে মুমিনদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে কখনো শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করতে এবং যখনই কোন মুমিন/মুমিনার বিরুদ্ধে কোন দুর্ণাম শুনা যাবে যাচাই না করে সেটা রটনা করা যাবেনা এমনকি বিশ্বাসও করা যাবেনা। যেখানে স্বয়ং রাসূলে মকবুল (সঃ) এবং 'মা আয়েশ (রাঃ)' কে জড়িয়ে এধরনের দুর্নাম ও রটনা হতে পারে তখন সাধারণ মুমিনদের তো কথাই নেই! তাই আজকাল আমরা দেখি ইসলাম বিরোধীরা সর্বত্র ইসলামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের মাধ্যমে চরিত্র হননের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। পত্র-পত্রিকা, ইলেট্রিক মিডিয়া তথা রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদিতে জঘন্য মিথ্যাচার, অপবাদ ও দূর্ণাম রটনা করে, যাতে সাধারণ জনগণ ইসলামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরিণামে ইসলাম থেকেই দূরে সরে যায়। এই ব্যাপারেই আল্লাহপাক সতর্ক করে বলেছেন তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করোনা, নির্লজ্জতা ও খারাপ কাজের বিস্তারে সহযোগিতা করোনা। এরপর আল্লাহপাক শয়তানের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের

www.nagorikpathagar.org

ভয়াবহতা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, যদি আল্লাহপাক তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে তোমাদেরকে পবিত্র ও অপবিত্রের পার্থক্য বুঝিয়ে না দিতেন এবং তোমাদেরকে সংশোধিত হওয়ার শিক্ষা ও সৌভাগ্য না দিতেন তাহলে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই নিজের বলে পবিত্র ও পায় পংকিলতা মুক্ত হতে পারতনা।

পরিশেষে আল্লাহপাক বলছেন কাকে পবিত্রতা দান করা হবে তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কিন্তু এই ইচ্ছা নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে কার্যকর হয়। কাহার মধ্যে প্রকৃত কল্যাণ ইচ্ছা অথবা অন্যায় প্রবণতা রয়েছে আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে মনে যেসব কথা চিন্তা ভাবনা করে এবং গোপনে যেসব কথাবার্তা বলে তা আল্লাহ পুরাপুরি জানতে ও শুনতে পান। এবং এই সরাসরি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি পবিত্রতা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতএব আমাদের উচিত শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং নির্লজ্জতা ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَانِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا، ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. ٢٧

হে মুমিনগণ! নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যলোকদের ঘরে প্রবেশ করোনা যতক্ষণ পর্যন্ত ঘরের লোকদের নিকট হতে সম্মতি না পাবে ঘরের লোকদের প্রতি সালাম না পাঠাবে। এই নিয়ম তোমাদের জন্য কল্যাণময়। আশা করা যায় তোমরা এটা স্মরণ রাখবে। সূরা (২৪) নূর, আয়াত-২৭

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান তথা কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়া ও সালাম দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যেন সবসময় এই বিধান মনে রাখা হয় ও পালন করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই অতি উপকারী বিধানটিও আজ আমাদের সমাজে অবহেলিত। এমনকি এর প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও অনেকে মনে করেননা।

মূল আয়াতে "হাত্তা তাসতানিসু" বলা হয়েছে যার শাব্দিক অর্থ আলাপ পরিচয় করে নেয়া যেটাকে সাধারণ ভাবে অনুমতি নেয়া বা সম্মতি লাভ কথা দ্বারা বুঝানো হয়। হঠাৎ করে কারো ঘরে প্রবেশ করলে গৃহবাসীদের অনেক অসুবিধা হয় এবং অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এই অসুবিধা দুর করার জন্য এই নীতি স্থির করে দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের থাকার জায়গার গোপনীয়তা লাভ করার অধিকার রয়েছে। কেহ অনুমতি ব্যতিরেকে তার নিভৃত স্থানে প্রবেশ করে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারবে না। এরূপ করা জায়েয নয়। এই হুকুম নাযিল হওয়ার পর রাসূল করীম (সঃ) নিম্ন লিখিত নিয়মনীতি চালু করেছিলেন-

www.nagorikpathagar.org

(১) রাসূল (সঃ) ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এই অধিকারকে শুধু ঘরে প্রবেশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, বরং তিনি উহাকে একটি সাধারণ অধিকার রূপে গন্য করেছেন। ইহার দৃষ্টিতে অপরের ঘরের মধ্যে তাকানো, বাহির হতে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ এমনকি অপরের চিঠিপত্রও তার অনুমতি ছাড়া পাঠ করা নিষিদ্ধ হয়েছে। রাসূল (সঃ) বলেছেন, "চক্ষু যখন ভিতরে চলে গেল তখন নিজে প্রবেশ করার অনুমতি চাওয়ার কি অর্থ হতে পারে?" আবু দাউদ।

(২) ফিকাহবিদগণ দৃষ্টি নিক্ষেপের ন্যায় ঘরের কথা শুনাকেও নিষিদ্ধ করেছেন। ইহাও মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারে হস্তক্ষেপ।

(৩) কেবল অপরের ঘরে প্রবেশ করার ব্যাপারে যে অনুমতি নিতে হবে এমন নয়। নিজের মা ও বোনের ঘরে প্রবেশ করতে হলেও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন "নিজের মায়ের নিকট যেতে হলেও কি অনুমতি নিতে হবে?" তিনি বললেন- হ্যাঁ। সে বলল "আমি ছাড়া তার খেদমত করার আর কেউ নেই। এখন প্রত্যেক বারই কি অনুমতি নেব?" তখন রাসূল (সঃ) বললেন "তুমি কি তোমার মাকে উলংগ অবস্থায় দেখা পছন্দ করবে?" তখন লোকটি বলল- না। তখন নবী (সঃ) বললেন "তবে অনুমতি নিয়ে যাও।"

(৪) অবশ্য কাহারো ঘরে কোন আকষ্মিক বিপদ দেখা দিলে তখন অনুমতি নেয়ার এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। যেমন ঘরে আগুন লেগে গেল অথবা চোর ঢুকল। এরূপ অবস্থায় সাহায্য প্রদানের জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যেতে পারে।

(৫) অনুমতি চাওয়ার নিয়ম হল প্রথমে সালাম করবে, অতঃপর নিজের নাম বলে পরিচয় দেবে এবং ভিতরে আসার জন্য অনুমতি চাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি নবী করীম (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বলতেন- "আসসালামু আলাইকুম হে আল্লাহর রাসূল (সঃ), ওমর ঘরে আসবে কি?"

(৬) অনুমতি নেয়ার জন্য রাসূল (সঃ) তিনবার ডাক দেয়ার নিয়ম করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তৃতীয়বার ডাক দিলেও যদি কোন জবাব পাওয়া না যায় তবে ফিরে যাও।

(৭) অনুমতি হয় গৃহকর্তা নিজে দেবে অথবা অপর কোন দায়িত্বসম্পন্ন লোক।

(৮) কারো শূন্য ঘরে প্রবেশ করা জায়েয নয়। অবশ্য ঘরের মালিক যদি কাকেও অনুমতি দিয়ে থাকে তবে ভিন্ন কথা। যেমন যদি সে বলে যে, আমি উপস্থিত না থাকলেও আপনি আমার কামরায় বসবেন। কিংবা সে অন্যত্র থেকে আপনার আগমন বার্তা শুনে যদি বলে আপনি বসুন, আমি আসছি। নতুবা ঘরে কেউ নেই কিংবা ভেতর হতেও কেউ কথা বলেনা এরূপ অবস্থায় বিনা অনুমতিতে কারো ঘরে প্রবেশ করা জায়েয নয়। পরবর্তী আয়াতে এটা সুস্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

(৯) কেউ যদি কারো সাথে দেখা করতে না চায় বা অস্বীকার করে কিংবা ব্যস্ততার দরুন সাক্ষাতে অপরাগ বলে ক্ষমা চায় তবে এতে কোন দোষ নেই। এরূপ করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। এ অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। কাকেও সাক্ষাতে বাধ্য করা কিংবা দরজায় শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে তার অসুবিধা সৃষ্টি করার কারো অধিকার নেই।

(১০) কারো বসবাসের জায়গা নয় এবং সেখানে কোন কাজ অথবা কাজের জিনিস থাকলে প্রবেশ করতে অনুমতির প্রয়োজন নেই। যেমন হোটেল, মুসাফিরখানা, মেহমান খানা, সরাইখানা, ডাক্তারখানা, দোকান পাট ইত্যাদি। যেখানে লোকদের প্রবেশ ও যাতায়াতের সাধারণ অনুমতি রয়েছে। ২৯নং আয়াতে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতএব আমাদের কর্তব্য অন্যের ঘরে প্রবেশ করার সময় প্রথমে সালাম করা, অতঃপর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা।

يَـاَيُّهَـا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَـاْذِنْكُمُ
الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَـانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ، مِنْ
قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
ثِيَـابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْـرَةِ وَمِنْ بَعْدِ
صَلٰوةِ الْعِشَـاۤءِ، ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ،
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ
هُنَّ، طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى
بَعْضٍ، كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ،
وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. ٥٨

হে মুমিনগণ তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাজের পূর্বে। দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পর। এই তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা (২৪) নূর, আয়াত-৫৮।

☆ সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতের নিয়ম একটু আগে ২৭, ২৮ ও ২৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বাহির থেকে আগত অপরিচিতদের জন্য বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছে সালাম ও পরিচয় দিয়ে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার জন্য। অনুমতি পাওয়া না গেলে ফিরে যাওয়ার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

আলোচ্য আয়াতে অন্য এক প্রকার অবস্থার জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যারা একে অপরের পরিচিত এবং একই জায়গায় একে অপরের সাথে থাকে এবং নানা প্রয়োজনে বারবার যাতায়াত করতে হয়, প্রায়শই তারা মুহাররাম ও নিকটাত্মীয় অথবা পারস্পরিক সম্পর্কের লোক। এমতাবস্থায় তাদের জন্য তিনটি বিশেষ সময়ে অনুমতি চাওয়ার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজর নামাজের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাজের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মহররাম আত্মীয় স্বজন এমনকি সমঝদার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা এবং দাস-দাসী তথা চাকর চাকরানীকেও আদেশ করা হয়েছে তারা যেন কারো নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা এসব সময় মানুষ স্বাধীন ও খোলামেলা থাকতে চায়। অতিরিক্ত বস্ত্র খুলে ফেলে এবং স্বামী স্ত্রী একান্তে থাকে। এসব সময়ে অন্য কেউ প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট অথবা বিরক্তি বোধ হয়। কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলামেলা ভাব ও বিশ্রামের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তাই আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে অনুমতি নিতে বলা হয়েছে। এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই সময়ে জিজ্ঞেস না করে ভেতরে এসোনা। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে- সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয় তখন নামাজ শিক্ষা দাও এবং নামাজ পড়ার আদেশ কর। দশ বছর হয়ে গেলে কঠোর ভাবে নামাজের আদেশ কর, দরকার হলে শাসনের মাধ্যমে নামাজ পড়তে বাধ্য কর। এমনিভাবে এখানে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষদের আসল আদেশ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে উল্লেখিত তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি তোমরা বিনা অনুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের কোনও অপরাধ হবে না। বস্তুত পক্ষে সর্বক্ষণ খোলামেলা থাকা কখনই উচিত নয় এবং যদি এরূপ কেউ থাকে তবে দোষটাতো তারই হবে।

অতএব আমাদের উচিত নিজেদের ঘর ও পরিবেশে অনুমতির প্রথা তথা ইসলামী আদব কায়দা চালু করা এবং সন্তান ও অধীনস্থদেরকে তা শিক্ষা দেয়া।

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ. ٥٦

হে আমার মুমিন বান্দাহগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত, অতএব তোমরা আমারই এবাদাত কর। সূরা (২৯) আনকাবুত, আয়াত-৫৬।

☆ আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে- যারা ধর্মীয় বিধি বিধান পালন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অজুহাত দেখায়- কোন অজুহাত দেখানোর সুযোগ নেই যে, আমরা ভাল কাজ করতে পারছিনা, অথবা আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি খারাপ কাজ করতে বাধ্য করছে। অথবা এমন কথা বলার কোন সুযোগ নেই যে এখন যুগ বদলে গেছে, সময় খারাপ হয়ে গেছে। আমাদেরকে অবশ্যই মন্দের প্রতিরোধ করতে হবে এবং

www.nagorikpathagar.org

ভালো কাজ করতে হবে। কেননা আল্লাহর সৃষ্টি জগত বিশাল বিস্তৃত এই কাজ করার জন্য। শুধু মাত্র প্রয়োজন আমাদের সংকল্প, অধ্যবসায় এবং দৃঢ়তা।

হয়তো প্রয়োজন হতে পারে আমাদের পাড়া, মহল্লা, গ্রাম, শহর অথবা দেশ পরিবর্তন করার অর্থাৎ হিজরত করা লাগতে পারে। অথবা আমাদের পড়শী তথা মেলামেশার লোকজন পরিবর্তন করা লাগতে পারে। অথবা আমাদের অভ্যাস অথবা সময় অথবা মর্যাদা অথবা সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তন করা লাগতে পারে। আল্লাহর আনুগত্য এই সকল জিনিস থেকে অনেক বেশী গুরত্বপূর্ণ। আমাদেরকে এ সকল দিক দিয়ে হিজরত করার জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। যেহেতু আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করার জন্য অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে রেখেছেন সুতরাং এটা আমাদেরই ব্যর্থতা যদি আমরা আল্লাহর আদেশ পালন না করি। সূরা জুমার ১০ নং আয়াতে একথা আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا، وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا. ٩

হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন। সূরা (৩৩) আহযাব, আয়াত-৯।

☆ আলোচ্য আয়াতে হিজরী ৫ম সনে অনুষ্ঠিত ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের এক সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ তথা ভাগ্য নির্ধারক যুদ্ধের শুরু ও শেষ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামকে নির্মূল করার জন্য আরবের মুশরিক, বেদুইন, ইহুদী ও মুনাফিকদের অপবিত্র জোট তৎকালীন আরবের গোত্রীয় রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকম বৃহত্তম সেনাবাহিনী (প্রায় ১২,০০০ সেনা) জড়ো করেছিল। এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। কুফরী জোটের প্রায় চার সপ্তাহ বিরামহীন প্রচেষ্টার পর তারা শুধু ব্যর্থতাই লাভ করে। ফলে তারা মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। মারাত্মক ঠান্ডা ঝড় তাদের উপর দিয়ে বয়ে যায়। তাদের তাবু সমূহ উড়ে যায় এবং আগুনগুলো নিভে যায়। বালি এবং বৃষ্টি তাদের উপর আঘাত হানে। এমতাবস্থায় মুসলিম বীর সেনাদের মুকাবেলায় তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। তাদের ঐক্যে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছিল এবং এই ঘটনার পর অতি দ্রুত তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল। অথচ মদিনার যোদ্ধা (মুসলিমরা) সর্বসাকুল্যে তিন হাজারের বেশী ছিলনা। এরই মধ্যে মুসলমানদের মিত্র

www.nagorikpathagar.org

ইহুদী গোত্র বনু কুরাইয়া গোপনে বিদ্রোহ করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। তাছাড়া মুনাফিকরাও গোপনে শত্রুপক্ষের সাথে আঁতাত করে। কিন্তু গোপন শক্তি মুসলমানদেরকে সাহায্য করে। তাদেরকে প্রাকৃতিক শক্তি ও নৈতিক শক্তি সহায়তা করে। শত্রু বাহিনীতে ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস আর মুসলিম বাহিনীতে ছিল যথার্থ শৃংখলা এবং সর্বোপরি রাসূল (সঃ) এর অতুলনীয় নেতৃত্ব। এছাড়াও "গোচরীভূত না হওয়া সৈন্যবাহিনী" বলতে বুঝানো হয়েছে যারা মানুষের যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহর ইশারায় কাজ করে। অথচ মানুষ তা জানতে পারেনা। মানুষতো যাবতীয় ঘটনা ও দুর্ঘটনার বাহ্যিক চেহারাই দেখতে পায়, বাহ্যিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভেতর ভেতর, লোক চক্ষুর অন্তরালে যেসব শক্তি কাজ করে তা মানুষের হিসাবে আসেনা। অথচ অনেক ক্ষেত্রে এই অদৃশ্য শক্তিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ যেহেতু সবকিছু দেখেন সুতরাং তিনি মুসলমানদের জীবন সংগ্রামের বিপরীতে কাফেরদেরকে পরাজিত করেছেন। যেখানে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে বিজয়তো দুরের কথা আত্মরক্ষা করতে পারার নূন্যতম সম্ভাবনাও ছিলনা, সেখানে কাফের জোট সম্পূর্ণ বিধস্ত হওয়া এবং মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় একমাত্র আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীর ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই মেহেরবানী এর পূর্বেও বর্ষিত হয়েছিল এবং এর পরেও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বর্তমানেও আমরা এ মেহেরবানী লাভ করতে পারি যদি আমরা এর হক আদায় করি। অর্থাৎ যদি আমরা যথার্থ ঈমানদার হই এবং যথার্থ তাকওয়ার অধিকারী হই। নমরুদের প্রজ্বলিত আগুনকে নিভানোর জন্য সেই আল্লাহ এখনো বর্তমান আছেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) এর সেই ঈমান প্রয়োজন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। অতএব আমাদের কর্তব্য সবসময় আল্লাহর নিয়ামতরাজীর শুকরিয়া আদায় করা এবং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا. ٤١

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে খুব বেশী করে স্মরণ কর। সূরা (৩৩) আহযাব, আয়াত-৪১।

☆ আল্লাহকে খুব বেশী করে স্মরণ করার অর্থ এই যে মুখে সব সময় সকল ব্যাপারেই কোন না কোন রকমে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে। কোন লোকের মধ্যে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি ততক্ষণ পর্যন্ত হয়না যতক্ষণ তার হৃদয়ে আল্লাহর চিন্তা খেয়াল সম্পূর্ণ দৃঢ়মূল হয়ে না যাবে। চেতনার স্তর থেকে অবচেতন ও অনবচেতন পর্যন্ত আল্লাহর চিন্তা গভীর হয়ে গেলেই একজন লোকের অবস্থা এরূপ হতে পারে যে, সে যে কাজই করবে আর যে কথাই বলবে তাতে আল্লাহর নাম অবশ্যই উচ্চারিত হবে। খাওয়ার প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবে, খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। বিছানায় শুয়ে সে আল্লাহর নাম স্মরণ

www.nagorikpathagar.org

করবে। ঘুম ভাংগলে ও শয্যা ত্যাগ করতে গিয়ে সে আল্লাহর নাম নেবে। সাধারণ কথা বার্তায় বারে বারে তার মুখে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও অনুরূপ অর্থের অন্যান্য বাক্যও তার মুখ থেকে বের হতে থাকবে। নিজের সব ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাবে, যে কোন নিয়ামাত পাবে আল্লাহর নিকট শুকর করবে। বিপদ আপদে আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক জটিলতা ও সমস্যায় কেবল আল্লাহর দিকে মুখ করবে। যে কোন অন্যায় ও পাপ কাজের সুযোগ আসবে তখনি কেবল আল্লাহকে ভয় করেই তা থেকে বিরত থাকবে। যে কোন অপরাধ হয়ে গেলে কালবিলম্ব না করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাবে। যে কোন প্রয়োজন দেখা দেবে তার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে। মোট কথা, উঠতে, বসতে, চলতে-ফিরতে ও দুনিয়ার সব কাজ করতে আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর নাম করাই হবে তার স্থায়ী নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে ইসলামী জীবনের প্রাণশক্তি। ইসলাম নির্ধারিত সবগুলো এবাদাতের জন্যই কোন না কোন সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। সে সময়ই উহা আদায় করা হয় আর আদায় হয়ে গেলে মানুষ তা থেকে অবসর পায়। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ এমন এক ইবাদাত যাহা প্রতিটি মুহূর্ত ও সকল সময়, সকল অবস্থায়ই জারী থাকে। আর মানব জীবনের এই সম্পর্ক তাকে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহ হওয়ার সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে রাখে। যাবতীয় এবাদত ও সমগ্র দ্বীনি কাজ এর সাহায্যেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। এর ফলে বিশেষ বিশেষ আমল বা ইবাদাতের সময় ছাড়াও আল্লাহর দিকে মন উম্মুখ হয়ে থাকে, মুখ সব সময়ই আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে। যদি বাস্তবিকই এরূপ অবস্থা কারো হয় তবে তার জীবনে তার ইবাদাত ও যাবতীয় কাজ উৎকর্ষ লাভ করে।

অতএব আমাদের উচিত নিজের জীবনে এই অবস্থা অর্জন করার চেষ্টা করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ٤٩

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন ঈমানদার মহিলাদেরকে বিবাহ কর এবং স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও তখন তোমাদের জন্য তাদের উপর ইদ্দত পালন করার বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই তাদিগকে কিছু সম্পদ দাও এবং উত্তমভাবে তাদেরকে বিদায় কর। সূরা (৩৩) আহযাব, আয়াত-৪৯।

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনা মহিলাদেরকে বিবাহ করার কথা বলা হয়েছে। এথেকে বুঝা যায় যে মুসলমানদের পক্ষে মুমিনা মহিলাদেরকেই বিবাহ করা বাঞ্চনীয়, ইহুদী ও খ্রীষ্টান মহিলাদেরকে বিবাহ করা জায়েয হলেও সমীচিন নয়, আর কাফের মহিলাদেরকেতো বিবাহ করাই যাবেনা। (সূরা বাকারা, আয়াত-২২১)।

হাত লাগানো বা স্পর্শ করা অর্থ অভিধানের দৃষ্টিতে কেবল ছোঁয়া মাত্র। কিন্তু এখানে ইংগিত মূলক অর্থে স্ত্রী সহবাস বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। বিবাহ করার পর স্বামী যদি স্ত্রী সংগম না করে থাকে, স্ত্রীর সাথে নির্জন বাস করুকইনা কেন, আর তার দেহে হাত লাগিয়ে থাকুক না কেন তবুও তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবেনা। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহাই মনে হয়। কিন্তু ফিকাহবিদগণ সতর্কতা অবলম্বনের নীতি অনুযায়ী এই রায় দিয়েছেন যে স্ত্রীর সাথে নির্বিঘ্ন ও পূর্ণমাত্রায় নির্জনবাস (যাতে স্ত্রী সঙ্গম সম্ভব) হলে অতঃপর যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়া হয় তবে স্ত্রীকে অবশ্যই ইদ্দত পালন করতে হবে। ইদ্দত পালন কেবল তখনই অপ্রয়োজনীয় হবে যখন তালাক এই নির্জনবাসের পূর্বে তা দেয়া হয়। নির্বিঘ্ন নির্জনবাসের পূর্বে দেওয়া তালাকে ইদ্দত বাতিল হওয়ার অর্থ এই যে, এরূপ অবস্থায় স্বামী আর তাকে ফিরিয়ে গ্রহণ করতে পারবেনা। এবং স্ত্রী তালাক হওয়ার পরই অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে।

"তোমাদের জন্য তাদের উপর কোন ইদ্দত পালন জরুরী নয়" এ থেকে বুঝা যায় যে ইদ্দত হচ্ছে নারীর উপর পুরুষের একটি অধিকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা কেবল পুরুষের অধিকারই নয়, মূলত ইহাতে আরো দু'টি অধিকারের প্রশ্ন রয়েছে। একটি হচ্ছে সন্তানের হক অপরটি আল্লাহর হক বা শরীয়াতের অধিকার। আর ইহাকে পুরুষের অধিকার একারণেই বলা হয় যে, এই সময়ে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহনের অধিকারী হয়ে থাকে (যদি তিন তালাক দিয়ে না থাকে)। উপরন্তু ইদ্দতকালে স্ত্রী গর্ভবতী কিনা তাহা জানা যায়। আর এই জানার উপরই সন্তানের বংশ প্রমাণ নির্ভর করে। আর সন্তানের বংশ প্রমাণ তাহার আইনগত অধিকার প্রমাণের জন্য একান্তই জরুরী বিধায় ইদ্দত পালনে সন্তানেরও হক রয়েছে। সন্তানের নৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার জন্যও সন্তানের বংশ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। আবার ইহাতে আল্লাহর হক বা শরীয়তের হকও এইজন্য স্বীকৃত যে, লোকেরা যদি নিজেদের বা নিজেদের সন্তানদের অধিকারের কোন পরওয়া নাও করে তবুও আল্লাহর শরীয়াতকে তো তাদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। এই কারণেই ইদ্দত পালন স্বামীর মতামতের উপর নির্ভরশীল নয়।

"তাহাদের কিছু মাল দাও এবং উত্তম পন্থায় তাদেরকে বিদায় কর" এই নির্দেশ পালন করতে হবে দুই পন্থার মধ্যে যে কোন একটির সাহায্যে : (ক) বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়

www.nagorikpathagar.org

মোহরানা নির্দিষ্ট হয়ে থাকলেও নির্জন বাসের পূর্বে তালাক দেয়া হলে স্ত্রীকে নির্দিষ্ট মোহরানার অর্ধেক বা তার চেয়ে বেশী দিয়ে বিদায় করতে হবে। ইহা ওয়াজিব। অবশ্য স্ত্রী যদি কোন প্রকার চাপে না পড়ে স্বেচ্ছায় মাফ করে দেয় তবে ভিন্ন কথা। যেমন সূরা বাকারার ২৩৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে। এছাড়াও বিবাহকালীন সময়ে যে সমস্ত জিনিস উপহার দেয়া হয়েছে যেমন শাড়ী, গহনা ব্যবহার্য সামগ্রী ইত্যাদি দিয়ে দেয়া উত্তম।

(খ) কিন্তু যদি বিবাহের সময় মোহরানা নির্ধারিত না হয়ে থাকে তবে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা ওয়াজিব। আর এটা স্বামীর আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টিতেই নির্দিষ্ট হবে। যেমন সূরা বাকারার ২৩৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে। উত্তম ভাবে বিদায় করার অর্থ কেবল এতটুকু সময়ে স্ত্রীকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা হবে এবং কোন প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দেয়া ব্যতিরেকেই ভদ্রভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া এর মধ্যে শামিল। কাহারো যদি তাহার স্ত্রীকে একান্তই পসন্দ না হয়ে থাকে কিংবা অপর কোন অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে সেজন্য সে তার স্ত্রীকে রাখতে চায়না তবে ভালো মানুষের মতই তাকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেয়া উচিত। তার দোষত্রুটি লোকদের মধ্যে প্রচার করা- যেন অপর কোন পুরুষও তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী না হয় তা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কুরআনের এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তালাক দেয়ার কাজটিকে কোন পঞ্চায়েত বা কোন আদালতের অনুমতির সহিত জড়িত করে দেয়া আল্লাহর শরীয়াত এবং উহার যুক্তিবত্তা ও কল্যাণকামীতার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এরূপ অবস্থায় কুরআনে উল্লেখিত “উত্তমভাবে বিদায় করা” আদৌ সম্ভব হতে পারেনা। তখন পুরুষ না চাইলেও নারীকে যে চরম লাঞ্ছনা, বদনাম ও অপমান হতে হয় তা কেউ রোধ করতে পারবেনা। উপরন্তু পুরুষের তালাক দেয়ার ক্ষমতাকে আদালত কিংবা পঞ্চায়েতের অনুমতির শর্তাধীন করে দেয়ারও কোন অবকাশ আলোচ্য আয়াতে বর্তমান নেই। এই আয়াতে তো সুস্পষ্ট ভাষায় স্বামীকে তালাক দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এবং তার উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে যে, স্পর্শ করার পূর্বে যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তাকে কিছু না কিছু এবং মোহরানা নির্ধারিত হয়ে থাকলে কমপক্ষে অর্ধেক মোহরানা আদায় করতে হবে। তালাক দেয়ার কাজকে নিছক ‘ছেলেখেলা’ হতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বামীর উপর মোহরানা এবং মাল দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লক্ষ্য- যেন, সে চিন্তা ভাবনা করেই নিজের এই ইখতিয়ার ব্যবহার করে এবং দুটি পরিবারের পারস্পরিক ব্যাপারে কোন বাহ্যিক হস্তক্ষেপের সুযোগ ও অবকাশ না থাকে। বরং স্বামী তার স্ত্রীকে কেন তালাক দিচ্ছে তা সে অপর কাউকেও জানাতে আদৌ বাধ্য নয়।

এ বাক্য হতে এটা বুঝা যায় যে, প্রথমে বিবাহ হয়ে গেলে পরে তালাক দিলেই তা কার্যকর হতে পারে। বিবাহের পূর্বে তালাক দেয়া অর্থহীন। কাজেই কেউ যদি বলে

www.nagorikpathagar.org

"আমি ওমুক স্ত্রীলোককে বা ওমুক বংশের, ওমুক ঘরের কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করলে সে তালাক হবে।" তবে এরূপ কথা অর্থহীন। এতে কারো উপর তালাক হবেনা।

অতএব আমাদের উচিত বিবাহ তালাকের ব্যাপারে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া, যাতে পরবর্তীতে কোনরূপ অসুবিধা বা অসহনীয় পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে না হয়।

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহার্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবী (সঃ) এর গৃহে প্রবেশ করোনা। তবে তোমরা আহূত হলে প্রবেশ করো, অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেওনা। নিশ্চয় এটা নবী (সাঃ) এর জন্য কষ্টকর। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। সূরা (৩৩) আহ্যাব ঃ আয়াত-৫৩

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْابُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَنٰظِرِيْنَ اِنٰهُ، وَلٰكِنْ اِذَادُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَاطَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَامُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ، اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْى مِنْكُمْ، وَاللّٰهُ لَايَسْتَحْى مِنَ الْحَقِّ، وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ، ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ، وَمَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَه مِنْۢ بَعْدِه اَبَدًا، اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا.

☆ আলোচ্য আয়াতে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সামাজিক শিষ্টাচার প্রাচীন আরবের বর্বর লোকদের শিক্ষা দেয়া যেমন জরুরী ছিল, আজকের দিনেও ঠিক তেমনি জরুরী। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এইভাবে খুটিনাটি বিষয়েও শিক্ষা দিয়েই ইসলামের পূর্ণাংগ জীবন বিধান বাস্তবায়ন করেন। এই আয়াতে যে সমস্ত বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে এভাবে বর্ণনা করা যায়-

www.nagorikpathagar.org

(১) কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যাবেনা। সূরা নূরের ২৭ নং আয়াতে এব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(২) যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয় তবে বেশী আগে যাওয়া উচিত নয়। আপনাকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়েছে খাওয়া প্রস্তুতের দাওয়াত দেয়া হয়নি।

(৩) সময় মত যেতে হবে যাতে আপনি তখনই প্রবেশ করবেন যখন আপনার উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে।

(৪) খাওয়ার পরে অথবা গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করে দাওয়াতকারীর অসুবিধা ও বিরক্তি উৎপাদন করা যাবেনা।

(৫) পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে নিতে হবে। কারণ মেজবান হয়তো ভদ্রতার খাতিরে চলে যেতে বলতে পারছেন না। এর সবগুলোরই একটি সামাজিক ও অধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে। অপরকে শ্রদ্ধা করা এবং মার্জিত ব্যবহার করা উত্তম চারিত্রিক গুণ।

যদিও একথাগুলো রাসূল (সঃ) এবং তাঁর ঘরকে নিয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এগুলো সাধারণভাবে সকলকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই আয়াতে পর্দার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) এর ঘরের স্ত্রীলোকদের কাহারো নিকট কাহারো কোন কাজ থাকলে সে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলবে। এই নির্দেশ আসার পর রাসূল (সঃ) এর স্ত্রীদের ঘরের দরজায় পর্দা টানিয়ে দেয়া হয়। আর রাসূল (সঃ) এর ঘর যেহেতু সব মুসলমানদের জন্যই আদর্শ এই কারণে দেখাদেখি সব মুসলমানরাই ঘরের দরজায় পর্দা টানিয়ে দিলেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় রাসূল (সঃ) এর পূন্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে যাদের অন্তরকে পাক সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এবং রাসূল (সঃ) এর ঘনিষ্টতম সংশ্লিষ্টতার কারণে তারা স্বত:ই পাক পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন। অপর দিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন রাসূল করীম (সঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যারা মানব কুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যাদের মধ্যে অনেকেরই মর্যাদা ফেরেশতা গণেরও উর্ধ্বে। অনেকেই এই দুনিয়াতে বেহেশতের শুভ সংবাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু এসব সত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন কে আছে যেতার মনকে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রী কন্যাদের মনকে পূন্যত্মা নবী (সঃ) এর পত্নীদের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে? আর এটা মনে করতে পারে যে,

নারীদের সাথে তাদের খোলামেলা মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবেনা। এখন আল্লাহর দেয়া দৃষ্টি লাভ করেছে এমন প্রতিটি নারী পুরুষই দেখতে পারে যে, যে মহান কিতাব স্ত্রীলোকদের পুরুষের সামনা সামনি ও মুখোমুখি হয়ে কথা বলা নিষেধ করে আর পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলার এই যুক্তি পেশ করে যে, "তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করার এটাই উপযুক্ত পন্থা" সে গ্রন্থ হতে নারী পুরুষের মিলিত বৈঠক, সভা-সমিতি, সহশিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার জায়েয হওয়ার কথা কি করে বের করা যেতে পারে? আর তা করা হলে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা নষ্ট না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে রাসূল (সঃ) এর মর্যাদা ও তাঁর স্ত্রীদের মর্যাদা আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল (সঃ) এর মর্যাদা বিবেচনা করলে দেখা যায় সকলে উপর সর্ব্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হওয়া তাঁর নূন্যতম প্রাপ্য। তার মর্যাদার বিষয় আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বই এর প্রয়োজন। আল্লাহর ঘোষণা তাঁকে সামান্যতম কষ্ট দেয়া কারো জন্য বৈধনয়, এবং যেখানে তিনি নিজের অসুবিধার কথা প্রকাশ করেননি সেখানে আল্লাহপাক নিজেই তা বর্ণনা করে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন- আলোচ্য আয়াতের এই বাক্যগুলো থেকেই তা স্বত:ই প্রকাশিত হয়। অতএব তাঁর এই অতুলনীয় মর্যাদার দাবী এই যে তাঁকে সামান্যতম ব্যাথা দিতে পারে অথবা বিরক্ত করতে পারে এমন কোন কিছু করা উচিত নয়। এটা শুধু তাঁর জীবদ্দশায়ই নয় এখনো সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ তাঁর শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব এখনো আমাদের কাছে জীবন্ত। তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদের সাথে কারো বিবাহ বৈধ নয়। এটা তাঁর এবং স্ত্রীদের মর্যাদার কারণেই প্রযোজ্য। তাছাড়া তাদেরকে মুমিনাগণের মায়ের মর্যাদায় আসীন করা হয়েছে। ইতিহাসে তাঁদের এই সম্মান যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ۚ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. ٥٦

নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবী (সঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠান। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠাও। সূরা (৩৩) আহযাব ঃ আয়াত-৫৬

☆ 'সালাওয়াত' শব্দের পর 'আলা' শব্দ ব্যবহৃত হলে একই সঙ্গে এর তিনটি অর্থ হতে পারে (১) কাহারো প্রতি ঝুকিয়ে পড়া, ভালোবাসা সহকারে কাহারো প্রতি আকৃষ্ট হওয়া (২) কাহারো প্রশংসা করা ও (৩) কাহারো জন্য দোয়া করা। অতএব ইহা যখন

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর কাজ রূপে গণ্য হবে তখন প্রথম দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হবে, অর্থাৎ তিনি তাঁর প্রতি অসীম মাত্রায় দয়াময় ও অনুগ্রহশীল এবং তিনি তাঁর প্রশংসা করেন, তাঁর (সঃ) কাজে বরকত দান করেন, তাঁর (সঃ) নাম বুলন্দ করেন এবং রাসূল (সঃ) এর প্রতি আল্লাহ্ রহমতের বারী বর্ষণ করেন। আর ফেরেশতাদের জন্য এ শব্দ ব্যবহৃত হলে উপরোক্ত তিনটি অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব ফেরেশতাদের দরুদ পাঠাবার অর্থ হল তাঁরা রাসূল করীম (সঃ)এর প্রতি খুব বেশী ভালবাসা পোষণ করেন তাঁর (সঃ) জন্য তাঁরা আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, আল্লাহ যেন তাঁকে (সঃ) বেশী বেশী উচ্চ মর্যাদা দান করেন। তাঁর (সঃ) প্রচারিত দ্বীনকে যেন বুলন্দ ও ব্যাপক করে দেন, তাঁর (সঃ) শরীয়াতকে যেন উন্নতি ও বিকাশ দান করেন। এবং তাঁকে (সঃ) যেন মাকামে মাহমুদে পৌছাইয়া দেন। আর মুমিনদেরকে নবী করীম (সঃ) এর জন্য 'সালাওয়াত' বলে নির্দেশ দেয়ার তৎপর্য এই যে তোমরা তাঁর (সঃ) জন্য - (১) প্রেমময় হও। (২) তারীফ ও প্রশংসায় মগ্ন হও এবং তাঁর (সঃ) জন্য দোয় কর। অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রাসূল (সঃ) এর নাম উচ্চারণ করলে অথবা শুনলে দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরুদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। - তিরমিযীর এক রেওয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন "সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হলে দরুদ পাঠ করেনা।" একই মজলিশে বারবার উচ্চারিত হলে একবার পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায় কিন্তু প্রতিবারই পাঠ করা মুস্তাহাব। মুখে নাম উচ্চারণ করলে বা শুনলে যেমন দরুদ ও সালাম ওয়াজিব তেমনি লিখলেও দরুদ ও সালাম লিখা ওয়াজিব। পয়গাম্বর ব্যতীত কারো জন্য 'সালাত' তথা দরুদ ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেমদের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন।

'সালাম' শব্দের দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি সর্বপ্রকার বিপদাপদ ও ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত থাকা, যেমন আমরা বলি শান্তি ও নিরাপত্তা। দ্বিতীয়টি সন্ধি তথা শত্রুতা-বিরুদ্ধহীনতা। অতএব নবী করীম (সঃ) এর জন্য "সাল্লিমু তাসলিমা" বলার একটি অর্থ হল তোমরা তাঁর (সঃ) জন্য পূর্ণ শান্তি ও নিরাত্তার জন্য প্রার্থনা করবে। আর দ্বিতীয় অর্থে তোমরা পূর্ণভাবে হৃদয় ও মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে (সঃ) সমর্থন ও সহযোগিতা করবে। তাঁর (সঃ) বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকবে ও তাঁর (সঃ) সত্যিকার নিষ্ঠাবান অনুগত হয়ে থাকবে।

এই হুকুম যখন নাযিল হয় তখন কতিপয় সাহাবী (রাঃ) রাসূলে করীম (সঃ) এর নিকটে এসে নিবেদন করলেন ঃ ইয়া রাসূলূল্লাহ (সঃ) সালাম দেয়ার নিয়মতো আপনি

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকে বলে দিয়েছেন, নামাযে আদায় করতে হবে "আস্সালামু আলাইকা আইয়্যহান নাবিউয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু" আর দেখা হলে বলতে হবে "আস্সালামুল আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ।" কিন্তু আপনার প্রতি "সালাওয়াত" পাঠাবার নিয়ম কি হবে? এর জওয়াবে নবী করীম (সঃ) বিভিন্ন সময়ে বহু সাহাবীকে (রাঃ) যে দরুদ শিক্ষা দিয়েছেন তাহাই আমরা নামাযে শেষ বৈঠকে পাঠ করে থাকি। বিভিন্ন সাহাবীর (রাঃ) বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য থাকলেও বিষয়বস্তু একই। এখানে একটির উদাহরণ দেয়া হল- "আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মদ, কামা সাল্লাইতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদি ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ।"

অতএব আমাদের কর্তব্য রাসূল (সঃ)-এর সত্যিকার নিষ্ঠাবান অনুগত হয়ে চলা এবং যখনই তাঁর (সঃ) নাম পড়ি, শুনি বা লিখি তখনই তাঁর (সঃ) প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা বা লিখা।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا، وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا. ٦٩

হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা মুসা (আঃ) কে কষ্ট দিয়েছিল। তারা যা বলেছিল আল্লাহ তা থেকে তাঁকে (আঃ) নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ছিলেন মর্যাদাবান। সূরা (৩৩) আহযাব আয়াত-৬৯

☆ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক মুমিনগণকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে- তারা যেন আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর সাথে সেরকম ব্যবহার না করে যেমন বনী ইসরাইলরা (ইহুদী) মুসা (আঃ) এর সাথে করেছিল। বনী ইসরাইলরা মুসা (আঃ) এর সাথে এবং অন্যান্য নবী (সঃ) এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিল তা তাদের ভাষায় বাইবেলে অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন যাত্রা পুস্তক ৫ঃ২০-২১, ১৪ঃ১১-১২, ১৬ঃ২-৩, ১৭ঃ৩-৪, এবং গণনা পুস্তক ১১ঃ১-১৫, ১৪ঃ১-১০, ১৬ সম্পূর্ণ অধ্যায়, ২০ঃ১-৫। কুরআন মজীদে বনী ইসরাইলদের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তারাও যেন এধরনের আচরণ গ্রহণ না করে। যদি করে তাহলে তাদেরকেও ইহুদীদের অনুরূপ শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। এখানে মুসলিমরা এরূপ কাজ করেছিল

www.nagorikpathagar.org

বলা হয়নি বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। হাদীসে কোন কোন সাহাবীর (রাঃ) যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তার অর্থ এই যে তাঁরা (রাঃ) কখনো এদিকে লক্ষ্য করেননি যে কথাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য কষ্টদায়ক হবে। ইচ্ছা পূর্বক কষ্ট দেয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে সবগুলোর কর্তাই মুনাফিকরা।

মুসা (আঃ) এর কাহিনী কি ছিল তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করে এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন- হযরত মুসা (আঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর (আঃ) দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর (আঃ) শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তার (আঃ) সম্প্রদায় বনী ঈসরাইলের মধ্যে সকলের সামনে উলংগ হয়ে গোসল করার, ব্যাপক প্রচলন ছিল। মুসা (আঃ) কারো সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেই বলাবলি করল এর কারণ এই যে তাঁর (আঃ) দেহে নিশ্চয়ই কোন খুঁত আছে। হয়তো তিনি ধবল কুষ্ঠ রোগী না হয় একশিরা রোগী নতুবা অন্য কোন ব্যাধিগ্রস্থ। আল্লাহতায়ালা এধরনের খুঁত থেকে মুসা (আঃ) এর নির্দোষিতা প্রমাণের ইচ্ছা করলেন। একদিন মুসা (আঃ) নির্জনে গোসল করার জন্য একখন্ড পাথরের উপর কাপড় খুলে রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খন্ডটি নড়ে উঠল এবং তাঁর (আঃ) কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। মুসা (আঃ) তাঁর লাঠি নিয়ে পাথরের পেছনে পেছনে 'আমার কাপড়' 'আমার কাপড়' বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তর খন্ডটি থামলনা যেতেই লাগল। অবশেষে পাথরটি বনী ঈসরাইলের এক সমাবেশে পৌছে থেমে গেল। তখন সেসব লোক মুসা (আঃ) কে উলংগ অবস্থায় দেখে নিল এবং তাঁর (আঃ) দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। এভাবেই আল্লাহপাক মুসা (আঃ) এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তর খন্ড থেমে যেতেই মুসা (আঃ) তাঁর লাঠি দিয়ে প্রস্তর খন্ডটিকে কয়েকবার আঘাত করলেন এবং তাঁর (আঃ) কাপড় উঠিয়ে পরে নিলেন। মুসা (আঃ) আল্লাহর কাছে মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহর কাছে কারো মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। মুসা (আঃ) যে এরূপ ছিলেন তার প্রমাণ কুরআনের অনেক ঘটনায় উল্লেখ রয়েছে। তিনি যেভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে অন্যতম ও বিস্ময়কর হারুন (আঃ) কে আল্লাহপাক তাঁর দোয়ায় নবুয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।

অতএব আমাদের কর্তব্য রাসূল (সঃ) এর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এরূপ কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

www.nagorikpathagar.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا. ٧٠

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। সূরা (৩৩) আহযাব ঃ আয়াত - ৭০

* আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহভীতি অবলম্বন করা। এর স্বরূপ আল্লাহর যাবতীয় বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলা বাহুল্য এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহ ভীতির আদেশের পর একটা বিশেষ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ "ক্বাওলান সাদিদা"- এর অর্থ সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা সবই হতে পারে। অর্থাৎ এমন কথা যা সত্য, তাতে মিথ্যার নাম গন্ধ নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই। গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে রসিকতার নাম গন্ধ নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়। সংক্ষেপে কথাবার্তার সংশোধন করা। এটাও আল্লাহ ভীতিরই একটা অংশ। কিন্তু এমন অংশ যা করা হয়ে গেলে খোদাভীতির অপর অংশগুলো অর্জন করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। যেমন এই আয়াতের পরেই বলা হয়েছে "ইয়াসলিহ লাকুম আ'মালাকুম" অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুল ভ্রান্তি থেকে নিবৃত্ত রাখ এবং সরল সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়ে যাও তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সর্ব কর্ম সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরো ওয়াদা করা হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্রটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

কুরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যেখানেই কোন কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেয়া হয় সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেয়া হয়। আল্লাহ ভীতি সমস্ত ধর্ম কর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার আদেশ করা হয়েছে। এর পরে এমন কর্ম বলে দেয়া হয়েছে যা অবলম্বন করলে আল্লাহভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ করে দেয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহকে ভয় কর বলার পর কথাবার্তা সংশোধন করতে বলা এরই একটি নযীর। এর পূর্বের আয়াতে আল্লাহর সৎ ও প্রিয় বান্দাহদেরকে কষ্ট দেয়া আল্লাহভীতির পথে একটি বিরাট বাধা বলে উল্লেখ হয়েছে। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহভীতি সহজ হয়ে যায়। সূরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে- "ওত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস্‌সাদেকীন" অর্থাৎ কথা ও কাজে সত্যবাদী লোকদের সাথে থাকলে আল্লাহভীতি অর্জন করা সহজ হয়ে যায়। সূরা হাশরের ১৮ নং আয়াতে "ওত্তাকুল্লাহ" আদেশের সাথে "ওয়াল তানযুর মা ক্বাদ্দামাত লিগাদ" বলা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা করা উচিত সে আগামীকাল অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের জন্য কি পুজি প্রেরণ করছে। এর সারমর্ম হচ্ছে পরকাল চিন্তা। এটাও আল্লাহ ভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

অতএব আমাদের কর্তব্য তাকওয়ার দাবী হিসেবে সবসময়েই সঠিক কথা বলা।

www.nagorikpathagar.org

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ، اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. ١٠

(হে নবী) বল ঃ হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এই দুনিয়ায় সৎ আচরণ গ্রহণ করেছ তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহর এই পৃথিবীতো বিশাল ও প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো তাদের প্রতিফল বে-হিসাবে দেয়া হবে। সূরা (৩৯) জুমার ঃ আয়াত-১০।

* আমরা যারা আল্লাহর বান্দাহ এবং রাসূলের (সঃ) উম্মত বলে নিজেদেরকে স্বীকার করি, আল্লাহর উপর ঈমান রাখি কিন্তু সামান্য প্রতিকূল অবস্থাতেই ঘাবড়ে যাই, দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের জন্য আল্লাহর হুকুম আহকামের পরোয়া করিনা, আলোচ্য আয়াতে তাদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে- যিনি আমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহকে ভয় করার জন্য। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহর এবাদাত বন্দেগী করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এবং কুফরী করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে ও বলা হয়েছে- জ্ঞানী ও অজ্ঞ লোকেরা কখনো সমান হতে পারেনা। অতএব তাদের আচরণও এক রকম নয়। এবং যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারাই যথার্থভাবে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে।

আলোচ্য আয়াতে আমাদেরকে সকল প্রকার ওযর আপত্তি ত্যাগ করে- আল্লাহকে, যিনি আমাদের পালনকর্তা তাঁকে সত্যিকারভাবে ভয় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুধু মুখে মুখে বা কখনো কখনো আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার এবং মুমিন হওয়ার দাবী করাই যথেষ্ট নয়। বরং সব সময়, সব অবস্থায়, সুখে-দুঃখে, সুবিধা-অসুবিধা, আপাত লাভ ক্ষতি যাই হোকনা কেন, আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করে যেতে হবে। এবং এই দুনিয়াটাই হচ্ছে সৎকর্মের স্থল সুতরাং এই দুনিয়াতেই আমাদেরকে যা কিছু অর্জন করার তা করতে হবে। সুতরাং কোন প্রকার ওযর আপত্তি করে সৎকাজ থেকে বিরত থাকা যাবেনা। যদি আমরা প্রতিদান তথা পুরস্কার চাই এর কোন বিকল্প নেই। আমাদের এই কথা বলার সুযোগ নেই- আমি যে জায়গায়, শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করি, অথবা যে পরিবেশে আটকে রয়েছি সেটা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। একথার জবাবে এখানে বলে দেয়া হয়েছে কোন বিশেষ রাষ্ট্র, অথবা শহর অথবা পরিবেশে থেকে যদি শরীয়াতের হুকুম আহকাম পালন করা দুষ্কর হয় তবে তা ত্যাগ করা উচিত। কারণ আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানেও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। আমাদের কাছে ঈমানের মূল্য যদি সাময়িক সুযোগ সুবিধা থেকে অধিক হয় তবে আমরা নির্দ্বিধায় সেটা করতে পারব। সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার উপর আল্লাহর হুকুম আহকামকে পালন করার সুযোগ সুবিধাকেই অগ্রাধিকার

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে আমরা সেখানেই চলে যাব। যেমনিভাবে মক্কা থেকে সাহাবীগণ (রাঃ) ও রাসূল করীম (সঃ) ঘরবাড়ী, সহায়-সম্পদ সবকিছু ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। সূরা আনকাবুতের ৫৬ নং আয়াতে এব্যাপারে বলা হয়েছে- "হে মুমিনগণ! আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত, অতএব আমারই এবাদাত কর।"

এই কাজের জন্য অত্যন্ত বৃহৎ ত্যাগ-কুরবানীর প্রয়োজন, অত্যন্ত বড় মনোবল ও ধৈর্যের প্রয়োজন, অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। সেজন্যই বলা হয়েছে যারা এই ধৈর্য অবলম্বন করতে পারবে তাদের জন্য রয়েছে অগণিত, বে-হিসাব পুরস্কার- প্রতিদান। হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন- কিয়ামাতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে হিসেবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামাজ, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদাতকারীগণের এবাদাত ওজন করে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃপর সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন ওজন বা মাপ হবেনা, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেয়া হবে। কুরতুবী (রঃ) বলেন صابرون শব্দকে অন্যকোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে কষ্ট সহ্যকারী সবরকারীর অর্থে ব্যবহৃত হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয় صابر علي كذا অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী বুঝা যায়।

অতএব আমাদের কর্তব্য আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ধৈর্য ধারণ করা। এবং প্রয়োজনে মহল্লা, গ্রাম, শহর বা রাষ্ট্র থেকে হিযরত করে হলেও আল্লাহর এবাদাতে যথাযথভাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. ٧

হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। এবং তোমাদের পা (স্থিতি)কে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। সূরা (৪৭) মুহাম্মদ, আয়াত-৭।

☆ আলোচ্য আয়াতে মুমিনদেরকে আহ্বান করা হয়েছে আল্লাহকে সাহায্য করার জন্য। অনুরূপভাবে সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে, সূরা হাদীদের ২৫ নং আয়াতে এবং সূরা সফের ১৪ নং আয়াতে আল্লাহকে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এক, একক ও অদ্বিতীয়। কারো মুখাপেক্ষী নন। তাহলে আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ কি? তদুপরি এখানে বলা হয়েছে আল্লাহকে সাহায্য করলেই আমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ আমাদের স্থায়িত্ব লাভ হবে। শক্তি সামর্থ অর্জিত হবে সে-টাই বা কিভাবে?

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যাপারে আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করলেই বুঝতে পারি আল্লাহকে সাহায্য করার সহজ সরল অর্থ তাঁর কালেমা সমুন্নত করার কাজ করা। অর্থাৎ তাঁর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী রূপে প্রতিষ্ঠা করার কাজ করা। যদিও আল্লাহপাক চাইলেই অন্যান্য সৃষ্টির মত মানুষ ও জীনকে সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনুগত বানিয়ে দিতে পারতেন, এবং তাঁর সকল প্রকার হুকুমের বিরোধিতা করার শক্তি সামর্থ রহিত করে দিতে পারতেন। কিন্তু সে-টা না করে তিনি মানুষ ও জীনকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি এবং অনেকটা বিস্তৃত ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়েছেন। এর ফলে মানুষ ও জীন আল্লাহর পছন্দনীয় দ্বীন ইসলাম অনুযায়ী চলতে পারে অথবা এর বিরোধিতা করতে পারে। মানব জীবনের যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইচ্ছা ও ইখতিয়ার প্রয়োগের সুযোগ-স্বাধীনতা দিয়েছেন সেখানে তিনি কুফর কিংবা ঈমান, বিদ্রোহ কিংবা আনুগত্যের পথ অবলম্বনের ব্যাপারে কাহাকেও তাঁর খোদায়ী শক্তি দ্বারা জোর পূর্বক বাধ্য করেন না। এর পরিবর্তে তিনি মুক্তি ও উপদেশের সাহায্যে মানুষকে এটাই বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, অস্বীকার, নাফরমানী ও বিদ্রোহের স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকা সত্বেও আগ্রহ সহকারে সৃষ্টিকর্তার বন্দেগী ও আনুগত্য কবুল করাই তার জন্য একমাত্র সত্য ও কল্যাণময় পথ। এভাবে বুঝিয়ে ও উপদেশ দিয়ে লোকদেরকে সত্যের পথে আনার চেষ্টা করাকেই আল্লাহর কাজ বলে বুঝানো হয়েছে। আর প্রয়োজনে একাজের সকল প্রতিবন্ধকতা দুর করাও এ কাজেরই অংশ। আর যেসব বান্দাহ আল্লাহর এই কাজে অংশগ্রহণ করে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের বন্ধু সাহায্যকারী বলে অভিহিত করেন। নামাজ রোজা ও অন্যান্য সকল প্রকার ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষ শুধু আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার হক পূর্ণ করে। পক্ষান্তরে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সাহচর্য, বন্ধুত্ব ও সাহায্যকারী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। এই দুনিয়ায় এটাই আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ স্থান।

আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে তাই বলা হয়েছে এই কাজ করলেই তারা দৃঢ়তা ও স্থিতি লাভ করতে সক্ষম হবে। ফলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবে।

অতএব আমাদের কর্তব্য শুধু বন্দেগী নয় বরং এর সাথে সাথে আনসারুল্লাহর মর্যাদা লাভের জন্য দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ۳۳

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য কর। আর নিজেদের আমল বিনষ্ট করোনা। সূরা (৪৭) মুহাম্মদ, আয়াত-৩৩।

☆ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর আনুগত্য করার সাথে সাথে রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূলত রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করলেই আমাদের পক্ষে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব। কারণ আল্লাহর আনুগত্য কি? তা জানার একমাত্র মাধ্যম রাসূল (সঃ) এবং কিভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে হয়? তাও শিখিয়েছেন রাসূল (সঃ)। আল্লাহর হুকুম আহকাম যে কুরআনে বর্ণীত, তাও আমাদের কাছে এসেছে রাসূল (সঃ) এর মাধ্যমে। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও একমাত্র গ্রহণযোগ্য রাসূল (সঃ) এর দেয়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এর ভিত্তিতে। এর বাহিরে কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। এর বাহিরে যা কিছুই করা হবে তা আপাতঃ দৃষ্টিতে যত সুন্দর বা উত্তমই মনে হোকনা কেন সেটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব আমাদের সকল আমল হতে হবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর নির্দেশিত পথে। এর বাহিরে হলে তা কোন নেক আমলই হতে পারেনা। এর জন্য কোন শুভফল লাভ করাতো দুরের কথা। এবং এ আয়াতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যাতে আমরা এই আনুগত্যের বাহিরে গিয়ে আমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট না করি।

অতএব আমাদের কর্তব্য আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর নির্দেশিত পথেই আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করা।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. ١

হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রসর হয়ে যেওনা (অতিক্রম করে যেওনা)। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন। সূরা (৪৯) হুজরাত, আয়াত-০১।

☆ আলোচ্য আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিষয় বর্ণীত হয়েছে। এটা ঈমানেরও প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী। বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে নিজের রব এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ) কে নিজের পথ প্রদর্শক, নীতি নির্ধারক ও বিধান দাতা তথা নেতা রূপে মেনে নেয়, সে যদি তার এই বিশ্বাসে সত্যবাদী হয় তাহলে নিজের মত ও চিন্তাকে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর ফায়সালার উপর অগ্রাধিকার দেয়ার কিংবা বাস্তব কাজকর্মে স্বাধীন ও নিরংকুশ মনোভাব পোষণ করার এবং নিজ ইচ্ছামত সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দুঃসাহস সে কখনই করতে পারেনা। সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) কোন পথ নির্দেশ দিয়েছেন কি দেন নাই, আর দিয়ে থাকলে তা কি এই দিকে একবিন্দু চিন্তাও না করে সে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণেই এখানে বলা হয়েছে যে, "হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর আগে ভাগে অগ্রসর হয়ে যেওনা।" অর্থাৎ তাঁদেরকে অতিক্রম করে চলে যেওনা। আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর পেছনে পেছনে চল। আগে ভাগে নয়। অগ্রবর্তী হয়োনা। অনুসারী হও। সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতেও অনুরূপ একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখানকার নির্দেশটি তা থেকেও খানিকটা বেশী। সে আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যে ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) ফয়সালা করে দিয়েছেন, সে ব্যাপারে কোন মুমিনই নিজস্বভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হতে পারেনা। ঈমানের সংগে এ অধিকারের কোন মিল নেই। আর এখানে বলা হয়েছে ঈমানদার লোকদের নিজেদের ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে নিজস্ব ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। বরং তাদের উচিত প্রথমেই দেখা যে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সঃ) সুন্নাতে কি হেদায়াত দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ কেবলমাত্র মুসলমানদের ব্যক্তিগত ব্যাপার সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,তাদের যাবতীয় সামষ্টিক ও সামগ্রিক ব্যাপার সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। আসলে ইহা ইসলামী আইনের একটি মৌলিক দফা। ইহা মানতে ও পালন করে চলতে মুসলমানদের রাষ্ট্র যেমন বাধ্য তেমনি বাধ্য মুসলমানদের আদালত ও আইন পরিষদ। এই সবের কোন একটিও এই বাধ্য বাধকতা হতে মুক্ত হতে পারেনা।

মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থ সমূহে সহীহ সনদ সূত্রে একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : হযরত রাসূলে করীম (সঃ) হযরত মুয়াজ ইবনে জাবালকে (রাঃ) যখন ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কোন জিনিষের ভিত্তিতে শাসন কার্য চালাবে ও বিচার আচার করবে? জবাবে তিনি বললেন আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী। রাসূল (সঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন কোন বিষয়ের হুকুম যদি আল্লাহর কিতাবে পাওয়া না যায়? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর রাসূল (সঃ) এর সুন্নাতের ভিত্তিতে। পুনরায় রাসূল (সঃ) বললেন যদি তাতেও পাওয়া না যায়? তিনি বললেন, তাহলে আমি ইজতিহাদ করব। এই কথা শুনে রাসূল (সঃ) তাঁর (হযরত মুয়াজ (রাঃ) এর) বুকে হাত রাখলেন ও বললেন, শোকর সেই মহান আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই পন্থা অনুসরণের যোগ্যতা ও সুযোগ দিয়েছেন যা তাঁর রাসূলের (সঃ) মনোপুত। বস্তুত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সঃ) সুন্নাতকে নিজের ইজতিহাদের উপর অগ্রবর্তিতা ও অগ্রাধিকার দেয়া এবং হেদায়াত লাভের জন্য সর্বপ্রথম কুরআন ও সুন্নাতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই এমন কাজ যা একজন মুসলমান বিচারপতি ও একজন অমুসলিম বিচারপতির মধ্যে পার্থক্য রচনা করে। অনুরূপভাবে আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও একথা চুড়ান্ত ও সর্বসমর্থিত যে আল্লাহর কিতাবই হল আইনের প্রথম উৎস। এরপর এবং সংগে সংগে স্থান হচ্ছে রাসূল (সঃ) এর সুন্নাতের। কোন মুসলিম ব্যক্তিদের নিজস্ব কিয়াস ও ইজতিহাদ তো দুরের কথা সমগ্র মুসলিম উম্মাতের ইজমাও এদুটি প্রধান ও প্রাথমিক আইন উৎসের উপর অগ্রাধিকার পেতে পারেনা, উহাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে না এবং উহা হতে মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারেনা।

আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) হতে বিমুখ হয়ে ও অমুখাপেক্ষী হয়ে, স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচার মূলক আচরণ অবলম্বন

কর অথবা নিজেদের মতামত ও ধারণাকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের উপর অগ্রাধিকার দাও কিংবা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশকে বাদ দিয়ে নিজেদের মত অনুযায়ীই কাজ কর, তাহলে জেনে রাখ যে তোমাদের ব্যাপারতো সেই আল্লাহর সাথে। যিনি তোমাদের সব কথাবার্তা শুনছেন। এবং তোমাদের নিয়াত-মনের অবস্থা ও ভাবধারা পর্যন্ত খুব ভাল করেই জানেন।

অতএব প্রতিটি ব্যাপারেই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের দেখা উচিত যথাক্রমে আল্লাহর কুরআন, রাসূলের (সঃ) সুন্নাহ, মুজতাহিদ আলেমদের ইজতিহাদ এবং পরবর্তীতে বিবেকের রায় যদি প্রয়োজন হয় তবে তা কি? এবং সবসময়ই এই ধারাক্রম অনুযায়ী একটিতে না পেলে অপরটিতে অগ্রসর হওয়া।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. ٢

হে মুমিনগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বর নবীর (সঃ) কণ্ঠস্বর অপেক্ষা উচ্চ করোনা। নবীর (সঃ) সাথে উচ্চ স্বরে কথাও বলবেনা, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাক। তোমাদের আমল সমূহ যেন বরবাদ হয়ে না যায় এমনভাবে যে তোমরা তা টেরও পাবেনা। সূরা (৪৯) হুজরাত, আয়াত-২।

☆ আলোচ্য আয়াতে রাসূল করীম (সঃ) এর মজলিশে যারা বসেন এবং তাঁর খেদমতে যারা হাজির থাকেন তাদের আদব কায়দা কেমন হওয়া উচিত সে কথাই বলা হয়েছে। এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রাসূল করীম (সঃ) এর সাথে সাক্ষাতকালে ও কথাবার্তায় ঈমানদার লোকেরা যেন অতিশয় সম্মান মর্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। লোকেরা রাসূল করীম (সঃ) কে সম্বোধন করে কথা বলার সময় যেন ভুলে না যায় যে তারা যার তার সাথে কথা বলছেন না। বরং তারা কথা বলছেন আল্লাহর মহান রাসূল (সঃ) এর সাথে। কাজেই একজন সাধারণ লোকের সাথে কথা বলা ও তাঁর সাথে কথা বলার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য হওয়া একান্তই কাম্য ও বাঞ্চনীয়। রাসূলে করীম (সঃ) এর কণ্ঠধ্বনী হতে অধিক উচ্চ স্বরে তাঁর সাথে কথা বলা কারো উচিত নয়। এই আদব কায়দা ও নিয়ম নীতি যদিও নবী করীম (সঃ) এর মজলিশের জন্য বলা হয়েছিল আর তা বলা হয়েছিল নবী করীম (সঃ) এর সময়ে যারা ছিলেন তাদেরকে সম্বোধন করে কিন্তু ইহা কেবলমাত্র সেই যুগের ও সেই সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়- সীমাবদ্ধও নয়। পরবর্তী কালের লোকদের জন্যও এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই আদব কায়দা ও নিয়ম নীতি একান্তভাবে অনুসরণীয়। যখন নবী করিম (সঃ) এর প্রসংগ উল্লেখিত হবে যখন তাঁর (সঃ) এর কোন নির্দেশ বা ফয়সালা শুনানো হবে অথবা তাঁর (সঃ) হাদীস পাঠ করা হবে তখনও

www.nagorikpathagar.org

ঠিক ইহাই করণীয়। এতদ্ব্যতীত মুরুব্বী ও অধিক বয়স্ক লোকদের সাথে কথাবার্তা বলার পদ্ধতি ও ধরণধারণ কি´হবে আলোচ্য আয়াতটিতে সেদিকে ইংগিত রয়েছে। কেহ যদি নিজের মুরুব্বী ও শ্রদ্ধা ভাজন লোকদের সাথে এমনভাবে কথাবার্তা বলে যেমন নিজের বন্ধুবান্ধব, সমবয়স্ক ও সাধারণ লোকদের সাথে বলা হয় বা বলা যায় তবে ইহা মূলত প্রমাণ করে যে তার মনে সেই লোকদের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধাবোধ বা ভক্তি সম্মান নেই। এবং সেই লোকের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে বলে সে মনে করেনা।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে আরো যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, দ্বীন ইসলামে রাসূলে করীম (সঃ) এর ব্যক্তি সত্বার মর্যাদা কতখানি, এর স্থান কোথায় ও গুরুত্ব কতদুর তা আল্লাহ তা'আলার এই কথাটি হতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। রাসূল করীম (সঃ) ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তির সাথে কোনরূপ বেয়াদবী করা হলে তা আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হতে পারেনা যা প্রকৃতপক্ষে কুফরীর শাস্তি- সেই লোক নিজস্বভাবে যতবড় সম্মানিত হোকনা কেন। তা খুব বেশী হলে একটা বেয়াদবী মাত্র; এর অধিক কিছু নয়। ইহা বড়জোর একটা অভদ্রজনিত আচরণ মাত্র। কিন্তু রসূলে করীম (সঃ) এর প্রতি সামান্য মাত্র অভদ্রতাও এতবড় গুনাহ যে, এর দরুণ লোকদের সারা জীবনের নেক আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে। এর কারণ এই যে, রসূলে করীম (সঃ) এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা মূলত সেই আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা যিনি তাঁকে নিজের রাসূল (সঃ) বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে সামান্য ত্রুটির অর্থ মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনে ত্রুটি করা। আর ইহা সুস্পষ্ট কুফরীর শামিল। তবে এখানে এটাও লক্ষণীয় যে যেহেতু আলেমগণ নবী করীম (সঃ) এর উত্তরাধিকারী সেহেতু তাঁদের প্রতিও যেন কোনরূপ অমর্যাদা প্রদর্শন করা না হয়। যদিও এটা কুফরীর পর্যায়ে পড়েনা তবে নিঃসন্দেহে বড় গুনাহ এবং আলেমদের অমর্যাদা প্রকারান্তরে ইসলামের প্রতি অমর্যাদা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ. ٦

হে মুমিনগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে তবে এর সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতা বশতঃ কোন জনগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। সূরা (৪৯) আল হুজরাত, আয়াত-৬।

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জনগণকে একটি নীতিগত হেদায়াত প্রদান করেছেন। তাহল কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, যার উপর কোন সুদুরপ্রসারী ঘটনা সংঘটিত হতে পারে- পাওয়া গেলে একে সত্য বলে মেনে নেয়ার পূর্বে সংবাদটির বাহক কি রকমের লোক তা যাচাই করে নিতে হবে। লোকটি যদি ফাসিক হয়ে থাকে অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা থেকে বুঝা যাবে যে তার কথা বিশ্বাস যোগ্য নয় তাহলে তার দেয়া সংবাদ অনুযায়ী কোন কর্মপন্থা গ্রহণের পূর্বে মূল ব্যাপারটি কি তা বিশেসভাবে তদন্ত করে দেখা আবশ্যক। আল্লাহর এই নির্দেশটি হতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াতি নিয়ম প্রকাশিত হয়। এই দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী নহে এমন ব্যক্তির দেয়া সংবাদের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী, দল বা জাতির বিরুদ্ধে কোনরূপ কর্মপন্থা গ্রহণ করা কোন ইসলামী সরকারের পক্ষে আদৌ জায়েয নয়। অনুরূপভাবে ফাসেক ব্যক্তির কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে যার উপর নির্ভর করে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। এই নিয়মানুযায়ীই হাদীস পারদর্শী (মুহাদ্দিসগণ) হাদীস শাস্ত্রে যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষার নীতি উদ্ভাবন করেছেন। এই নীতির দরুনই নবী করীম (সঃ) এর হাদীস সমূহ যেসব লোকের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের নিকট পৌঁছেছে তাদের অবস্থা ভালভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা হয়। ফিকাহবিদগণ সাক্ষ্য আইনে এই নিয়ম চালু করেছেন যে, যে ব্যাপার হতে কোন শরীয়াতী নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন ব্যক্তির উপর কোন অধিকার ধার্য হয় তাতে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। অবশ্য এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে যে সাধারণ বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে প্রতিটি সংবাদের যাচাই পরখ করা এবং সংবাদ বাহকের বিশ্বাস যোগ্য হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিন্ততা লাভ করা জরুরী নয়।

অতএব আমাদের কর্তব্য কোন সংবাদের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে সংবাদটির ও বাহকের অবস্থা যাচাই বাছাই করে অতঃপর সিদ্ধান্ত নেয়া।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ
مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى
اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ، وَلَا تَلْمِزُوْٓا
اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ،
بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ
الْاِيْمَانِ ، وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ . ١١

হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষদের উপহাস না করে। কেননা হতে পারে তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। কোন মহিলা যেন অপর মহিলাদের উপহাস না করে। কেননা হতে পারে তারা উপহাসকারীনীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা নিজেদেরকে (একে অপরকে) দোষারোপ করোনা। এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা। ঈমান আনার পর ফাসিক কাজ করা খুবই খারাপ। যেসব লোক এসব আচার আচরণ থেকে তাওবা করেনা তারাই জালিম। সূরা (৪৯) হুজরাত, আয়াত-১১।

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে সমাজের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক সাধারণভাবে খারাপ করে দেয় ও নষ্ট করে এমন বড় বড় দোষ ত্রুটিগুলো বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো, একজনের মান সম্মানের উপর অন্যজনের আক্রমণ, একজনের পক্ষে অন্যজনের মনে কষ্ট দেয়া। পারস্পরিক অবিশ্বাস ও খারাপ ধারণা পোষণ। এবং পারস্পরিক দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানো। বস্তুত এগুলোই হচ্ছে সেই কারণ যার দরুণ পারস্পরিক শত্রুতার সৃষ্টি হয় এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। পরে এই শত্রুতাই অন্যান্য কারণের সাথে মিলিত হয়ে বিরাট ফিতনা ও চরম অশান্তি সৃষ্টি করে।

বিদ্রুপ বা ঠাট্টা করা বিভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে যেমন- কারো নকল বেশ ধারণ করা। বা প্রতিকৃতি বা পুত্তলিকা বানানো। কারো প্রতি বিদ্রুপাত্মক ইংগিত করা। কারো কথা, কাজ, আকার আকৃতি পোশাক ইত্যাদি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা, অথবা কারো কোন দোষ বা ত্রুটির দিকে লোকদের দৃষ্টি এমনভাবে আকৃষ্ট করা যেন তারা সেজন্য বিদ্রুপের হাসি হাসে- এসব কিছুই অপমানকর ঠাট্টা বিদ্রুপ পর্যায়ে গন্য। বস্তুত একজন লোক অন্যকোন ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে আলোচ্য আয়াতে এটাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা একাজে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ ও অন্যজনকে অপমান, লাঞ্ছনা ও হেয় জ্ঞান করার ভাবধারা তীব্রভাবে কার্যকর থাকে। আর চরিত্র ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে ইহাই নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর। উপরন্ত ইহাতেই অন্য ব্যক্তির মনে আঘাত দেয়া হয়। এবং এর ফলেই সমাজে বিপর্যয় ঘটে। এ কারণেই একাজটি হারাম ঘোষিত হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, আলোচ্য আয়াতে পুরুষ ও মহিলাদের বিষয়ে আলাদা আলাদা ভাবে তাদের পারস্পরিক আচার আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মহিলাদের পক্ষে পুরুষদের প্রতি হাসি ঠাট্টা করা কিংবা পুরুষদের পক্ষে মহিলাদের প্রতি হাসি ঠাট্টা করা বুঝি জায়েয। উভয়ের কথা আলাদা আলাদাভাবে বলার আসল কারণ হল ইসলামে মহিলা-পুরুষের মিশ্র সমাজ/সমাবেশ মূলতই সমর্থিত নয়। এবং কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। পারস্পরিক ঠাট্টা বিদ্রুপের কাজ সাধারণত অবাধ ও ঘনিষ্ট সমাজ পরিমন্ডলের মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু মুহাররম নয় এমন মহিলা পুরুষ কোন একটি মজলিশে একত্রিত হয়ে পরস্পরে হাসি ঠাট্টা করতে পারে ইসলামে এর কোন সুযোগ রাখা হয়নি। কাজেই কোন এক মজলিশে বা আসরে একত্রিত হয়ে পুরুষ ও মহিলা বা মহিলা ও পুরুষ পরস্পর ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে মুসলিম সমাজে এটা ধারণাতীত।

আলোচ্য আয়াতে পরবর্তী অংশে لمز। শব্দ ব্যবহার করে বিষয়টিকে আরো ব্যাপক অর্থবোধক করা হয়েছে। যেমন-ঠাট্টা, বিদ্রুপ, ভৎর্সনা, গালাগাল, একচোট নেয়া, উপহাস করা, মিথ্যা দোষারোপ করা, কথায় কথায় আপত্তি তোলা, দোষ ও খুঁত খুজে বেড়ানো এবং স্পষ্টভাবে কিংবা ইশারা ইংগিতে কাহাকেও তিরস্কারের লক্ষ্য বস্তু বানানো ইত্যাদি। একাজগুলো পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে ও এর দরুন সমাজে

www.nagorikpathagar.org

কঠিন ও ব্যাপক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। একারণেই এসব কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে বর্ণিত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দে পরস্পর ঠাট্টা বিদ্রুপ করবেনার পরিবর্তে বলা হয়েছে "নিজেদের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করবেনা।" এর দ্বারা একথাই বলা উদ্দেশ্য যে মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। অতএব অপরকে ঠাট্টা করা প্রকারান্তরে নিজেকে ঠাট্টা করা। এছাড়াও অপরকে ঠাট্টা করলে শব্দের প্রতিধ্বনির মত সেও ঠাট্টাকারীকে ঠাট্টা করবে। অতএব পরিণামে নিজেকেই ঠাট্টা করা হয়।

অতঃপর আরো বিস্তারিত বলে দেয়া হয়েছে অপরকে যেন খারাপ উপনামে ডাকা না হয়। এমন উপনাম যা তার সহ্যাতীত এবং যাতে তার অপমান বা লাঞ্ছনার কারণ ঘটে। যেমন কাকেও ফাসিক, মুনাফিক বলা, কোন সুষ্ঠু সুঠাম দেহী ব্যক্তিকে পংগু, অন্ধ, বধির বা পাগল বলা। কাহাকেও তার নিজের বা পিতা-মাতার বা বংশ পরিবারের দোষক্রটি ধরে সম্বোধন করা ইত্যাদি। তবে যেসব উপনাম বা উপাধি বাহ্যত দৃষ্টিকটু হলেও প্রকৃতপক্ষে নিন্দনীয় নয় বা এতে মনক্ষুণ্ণ হয়না এবং শুধুমাত্র পরিচয়া জ্ঞাপক তা এই নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। অতঃপর বলা হয়েছে একব্যাক্তি ঈমানদার হয়েও অশালীন কথাবার্তায় খাতি অর্জন করবে এটা খুবই লজ্জাকর ব্যাপা। একজন কাফির যদি লোকদের ঠাট্টা -বিদ্রুপ, উপহাস করায় বা খারাপ নামকরণে খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করে তবে তাহা মানবতার জন্য যতই কলংকপূর্ণ হোক না কেন তার কুফরীর পক্ষে শোভনীয় হতে পারে। কিন্তু যে লোক আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ) ও পরকালের প্রতি ঈমান আনার পরেও এধরনের লজ্জাকর কাজে কুখ্যাত হয়ে পড়ে তারতো লজ্জায় সমাজে মুখ না দেখানো উচিত।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে কারো দ্বারা এ ধরনের ফাসিকি বা গুণাহর কাজ হয়ে গেলে তার তাওবা করা উচিত। অর্থাৎ এই গুনাহর জন্য যাকে মনে কষ্ট দিয়েছে বা মানহানি করেছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। সাথে সাথে আল্লাহর দরবারেও ক্ষমা চাওয়া এবং ভবিষ্যতে এধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা উচিত। না হলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে জালিম বলে গণ্য হবে। এবং জালিমের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ، اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا، اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ

হে মুমিনগণ! তোমরা খুব বেশী (খারাপ) ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন ধারণা অনুমান গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করোনা। তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত (পশ্চাতে নিন্দা) না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত

www.nagorikpathagar.org

أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. ١٢

খাওয়া পসন্দ করবে? তোমরাতো একে ঘৃনাই করে থাক। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী এবং দায়বান। সূরা (৪৮) হুজরাত ঃ আয়াত-১২

☆ আলোচ্য আয়াতে পারস্পরিক হক (অধিকার) ও সামাজিক রীতি নীতির তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেকটিই বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবী রাখে - (১) বেশী বেশী ধারণা অনুমান। (২) গোপনীয় বিষয় সন্ধান করা (৩) গীবত বা পশ্চাতে নিন্দা করা।

প্রথমত বেশী ধারণা ঃ ধারণা অনুমান বিভিন্ন পর্যায়ের অথবা বিভিন্ন প্রকারের থাকতে পারে। আমরা একে চারভাগে ভাগ করতে পারি- (ক) হারাম (খ) জায়েয (গ) মুস্তাহাব (ঘ) ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা ভংগি থেকে বুঝা যায় যে, সব ধরনের ধারণা অনুমানকে হারাম ঘোষণা করা হয়নি। বলা হয়েছে বেশী বেশী ধারণা অনুমান থেকে বিরত থাক।

(ক) আলোচ্য আয়াতের মূল লক্ষ্য যেসব ধারণা অনুমান সেগুলো হচ্ছে কারো সম্পর্কে অকারণে খারাপ ধারণা পোষণ করা। লোকদের কাজ কর্মের বিভিন্ন কারণ বা দিক চিন্তা না করে তাদেরকে খারাপ বলে ধরে নিয়ে সে অনুযায়ী আচরণ করা গুনাহ এবং হারাম।

(খ) কোন ব্যক্তি বা দলের চরিত্র, কাজকর্ম ও ভূমিকায় যদি এমন প্রমাণাদি বর্তমান থাকে যার দরুন তার উপর ভালো ধারণার চেয়ে খারাপ ধারণা করাই যুক্তি সংগত তবে সেটাই জায়েজ। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সীমা লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং শুধুমাত্র তার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

(গ) যে সব ধারণা অনুমান নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত শুভ, দ্বীনের দৃষ্টিতে কাম্য এবং প্রশংসাযোগ্য যেমন- আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিন লোকদের প্রতি শুভ ধারণা এবং যাদের সাথে দিন-রাত সার্বক্ষণিক সাক্ষাত, কাজকর্ম ও মিলামিশা তাদের প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব।

(ঘ) কতক ক্ষেত্রে ধারণা -অনুমান করা ওয়াজিব। অর্থাৎ ধারণা-অনুমান ছাড়া এক্ষেত্রে কাজ করা যায়না। যেমন বিচারকের সামনে যেসব সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা হয়, তা যাচাই বাছাই করে অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। এছাড়াও জীবনের সকল ক্ষেত্রে সব সময় প্রত্যক্ষ বা সরাসরি জ্ঞানের বা জানার ভিত্তিতে কাজ করা সম্ভব হয়না। এক্ষেত্রে ধারণা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকেনা। বস্তুত ধারণাকে চিন্তা গবেষণা ও পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা জগতের বিকাশ বৃদ্ধি ও উন্নতি উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব হয়না।

www.nagorikpathagar.org

ফলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ধারণা অনুমান স্বতই কোন নিষিদ্ধ জিনিস নহে। বরং কোন সময় একান্ত জরুরী, কোন কোন ক্ষেত্রে পছন্দনীয়, কখনো কখনো একটা সীমা পর্যন্ত জায়েয এবং অনেক ক্ষেত্রে হারাম বা নিষিদ্ধ। একারণে কুরআন মজীদে একথা বলা হয়নি যে সব ধারণা অনুমান বা খারাপ ধারণা সম্পূর্ণ পরিহার কর বরং বলা হয়েছে খুব বেশী ধারণা অনুমান করা পরিহার কর। সাথে সাথে এই নির্দেশের মূল লক্ষ্য স্পষ্ট করে তুলবার জন্য অতিরিক্ত একথা বলা হয়েছে যে কোন কোন ধারণা অনুমান গুনাহ হয়ে থাকে। এরূপ বলায় স্বতই একথা বের হয়ে আসে যে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য যখনই কোন ব্যক্তি ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে কোন মত ঠিক করে বা কোন পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয় তখন তার উচিত খুব ভাল করে যাচাই পরখ করে দেখা যে, সে যে ধারণা অনুমান করছে তাতে গুনাহ হয়ে যাচ্ছে কি? এর ফলে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তা-কি সংগত? এরূপ সতর্কতা প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবলম্বন করা কর্তব্য যিনি আল্লাহকে ভয় করেন। নিজের ধারণা অনুমানকে নিরংকুশ ও নিঃসন্দেহ বা শর্তহীন বানিয়ে নেয়া কেবলমাত্র সে সব লোকদের কাজ হতে পারে যারা আল্লাহকে ভয় করেনা এবং পরকালের শাস্তি সম্পর্কেও কোন চিন্তা মনে পোষণ করেনা।

(২) দ্বিতীয়ত যে বিষয়ে আলোচ্য আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে- লোকদের গোপন তত্ত্ব ও তথ্য খুঁজে বেড়ানো যাবেনা। একজন অপরজনের দোষত্রুটি তালাশ করে বেড়িওনা। অন্য লোকদের দোষত্রুটি ধরবার জন্য ওঁৎপেতে থেকোনা। এরূপ কাজ মনে মনে খারাপ ধারণা পোষণ করে করা হোক, কিংবা কারো ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে করা হোক- অথবা নিছক নিজের কৌতুহল চিরতার্থ করার উদ্দেশ্যেই করা হোক সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব কাজ পছন্দ বা যেসব কাজের উপর অপ্রকাশের আবরণ পড়ে রয়েছে তা খুঁজে খুঁজে বেড়ানো ও আবরণের অপরদিকে কি আছে তা উঁকি মেরে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করা, কার কি ধরনের বা কতটা দোষত্রুটি রয়েছে তা জানতে চেষ্টা করা একজন ঈমানদার লোকের কাজ হতে পারেনা। লোকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দুজন লোকের পারস্পরিক কথাবার্তা কানপেতে শুনা, প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি মারা এবং নানাভাবে অন্য লোকদের পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনের বা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারাদি আঁতিপাতি করে খুঁজে বেড়ানো অত্যন্ত বড় ধরনের অনৈতিক কাজ। এর ফলে সমাজে নানা ধরনের বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। একটি হাদীসে এসম্পর্কে বলা হয়েছে "হে মুখে মুখে ঈমানগ্রহণকারী লোকেরা যাদের অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি, তোমরা শোন- মুসলমানদের গোপন অবস্থার খোঁজ করোনা, কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবার কাজে লিপ্ত হবে, আল্লাহ নিজেই তার দোষত্রুটি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। আর আল্লাহ যার পেছনে লেগে যান তাকে তার ঘরেই লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

www.nagorikpathagar.org

দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর এই নিষেধ কেবলমাত্র ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যেও ইহাই কর্মনীতি। শরীয়ত অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করা ও বিরত রাখার দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পণ করেছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সরকার একটা গোয়েন্দা বিভাগ গড়ে তুলে লোকদের গোপন দোষত্রুটি সমূহ আঁতি পাতি করে খুঁজে বের করবে ও সেজন্য লোকদেরকে শাস্তি দেবে। বরং সরকারের দায়িত্ব হ'ল প্রকাশিত দোষত্রুটি সমূহ দূর করার জন্য শক্তি ব্যয় করা। কেননা গোপন দোষত্রুটি দূর বা সংশোধন করা গোয়েন্দাগিরির পথে কখনই সম্ভবপর নয়। সেজন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, ওয়ায-নসিহত, আদেশ-উপদেশ, জনগণের সামষ্টিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন-"প্রশাসন কর্তৃপক্ষ যদি জনগণের প্রতি সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তাদের দোষ খুঁজতে শুরু করে, তখন তারা তাদেরকে বিপর্যস্ত করে ছাড়ে।" ইহা ইসলামের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর আচার আচরণে বিপর্যয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি যদি প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায় এবং সে বা তারা কোন অপরাধ জনক কাজে লিপ্ত হতে পারে বলে আশংকা হয় তখন সরকার তার বা তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কেহ কোন পরিবারে বিবাহের প্রস্তাব দিলে কিংবা কেহ কাহারো সাথে একত্রে কোন কাজ কারবার করতে ইচ্ছা করলে তখন সে নিজের নিশ্চিন্ততা অর্জনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যাচাই ও পরীক্ষা করতে পারে।

(৩) তৃতীয়ত ঃ যে বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হল গীবত বা পরনিন্দা, পশ্চাতে নিন্দা। গীবত এর সংজ্ঞা হচ্ছে "কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যা জানতে পারলে সে অপসন্দ করবে।" নবী করীম (সঃ) এর একটি হাদীস আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও অন্যান্য সহীহ হাদীস গ্রন্থ সমূহে উদ্বৃত্ত হয়েছে যে- "গীবত হল তুমি তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমনভাবে উল্লেখ করবে যে তা তার অপছন্দ হবে। নিবেদন করা হল, আমার সে ভাইয়ের মধ্যে যদি সে দোষ পাওয়া যায় যা আমি বলছি তাহলে আপনার মত কি? বললেন তার মধ্যে সে দোষ যদি পাওয়া যায় তবেই তো তুমি তার 'গীবত' করলে, আর যদি তা তার মধ্যে নাই থাকে তাহলে তুমি তার উপর 'বুহতান' বা মিথ্যা-মিথ্যি দোষারোপ করলে।" অতএব কারো বিরুদ্ধে তার পশ্চাতে মিথ্যা অভিযোগ তোলাকে 'বুহতান' বলা হয় আর তার সত্যিকার দোষের কথা বলাই হচ্ছে 'গীবত'। এরূপ বলা স্পষ্ট ভাষায় কিংবা আকার ইংগিতে তাতে কোন পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থায়ই ইহা হারাম। অনুরূপভাবে ইহা ব্যক্তির জীবদ্দশায় কিংবা তার মৃত্যুর পর করা হোক উভয় অবস্থায় হারাম।

www.nagorikpathagar.org

তবে কারো অনুপস্থিতিতে বা কারো মৃত্যুর পর দোষক্রটি বর্ণনা করা যদি বাস্তবিকই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে এবং সেই প্রয়োজন শরীয়াত সম্মত হয় এবং অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে গীবত না করলে গীবত অপেক্ষাও বড় কোন খারাবী দেখা দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে তবে সেই গীবত করা নিষিদ্ধ বিবেচিত হবেনা। নবী করীম (সঃ) সেই গীবতের অনুমতি একটি নীতি কথার মাধ্যমে দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে ঃ কোন মুসলমানের মান সম্মানের উপর অকারণ ও অন্যায় আক্রমণ খুব নিকৃষ্ট ধরনের বাড়াবাড়ি" (আবু দাউদ)। একথাটিতে অকারণ ও অন্যায় বলে যে শর্তারোপ করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারা যায় যে কারণে ও ন্যায়সংগতভাবে এরূপ করা সম্পূর্ণ জায়েয হবে। এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সঃ) এর কর্মপদ্ধতিতে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই যা থেকে এই কারন ও ন্যায়সংগত বলতে কি বুঝায় তা আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। ফাতিমা বিনতে কায়েস নাম্মী এক মহিলাকে (রা) বিবাহ করার জন্য একসঙ্গে ও একই সময় দুই ব্যক্তি প্রস্তাব দেন। একজন হলেন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ), দ্বিতীয় জন হলেন হযরত আবুল জাহাম (রাঃ)। মহিলাটির লোকেরা এসে নবী করীম (সাঃ) এর নিকট পরামর্শ চাইলেন। তিনি বললেন, মুয়াবিয়া (রাঃ) দরিদ্র ব্যক্তি। আর আবুল জাহাম (রাঃ) স্ত্রীদেরকে খুব মারপিট করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) এব্যাপারটিতে একজন মহিলার ভবিষ্যত জীবনের সমস্যা জড়িত ছিল এবং সংশ্লিষ্ট লোকেরা -নবী করীম (সঃ) এর পরামর্শ চেয়েছিল। এরূপ অবস্থায় নবী করীম (সঃ) প্রস্তাবক ব্যক্তিদ্বয়ের দুর্বলতার কথা যা তিনি জানতেন বলে দেয়া প্রয়োজন মনে করলেন।

এই সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের দৃষ্টান্ত থেকে ফিকাহবিদগণ এই মূলনীতি গ্রহণ করেছেন যে, "গীবত কেবলমাত্র তখনই জায়েয যখন শরীয়াতের দৃষ্টিতে যথার্থ উদ্দেশ্যে উহা করা জরুরী হয়ে পড়ে এবং সেই প্রয়োজন ইহা ছাড়া পূরণ হওয়ার অন্য কোন পথ বা উপায় থাকবেনা। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে গীবতকে জায়েয বলা হয়েছে-

(ক) জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের অভিযোগ এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সামনে উথাপন করা যার ফলে তার জুলুম বন্ধ করার জন্য কিছু না কিছু করতে পারে।

(খ) সংশোধনীর উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর দোষক্রটির উল্লেখ এমন সব লোকদের সামনে করা যার বা যাদের দ্বারা তা দুর করা সম্ভব বলে মনে করা হবে।

(গ) ফতোয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুফতীর নিকট প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করা- যাতে কোন লোকের ভুল বা খারাপ কাজের উল্লেখ থাকবে।

(ঘ) কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের (দোষক্রটির) ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া যেন তার বা তাদের ক্ষতিকর কার্যক্রম থেকে জনগণ রক্ষা পেতে পারে। যেমন হাদীসের বর্ণনাকারী, সাক্ষ্যদাতা ও গ্রন্থকারদের ভুলক্রটি প্রকাশ করে দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে শুধু জায়েযই নয় ইহা ওয়াজিব। কেননা ইহা করা না হলে ভুল বর্ণনা প্রচার হতে

www.nagorikpathagar.org

শরীয়াতকে, অবিচার ও নাইনসাফী হতে আদালত সমূহকে এবং জনগণ বা ইলম সন্ধানকারীদেরকে গুমরাহী বা ভুলভ্রান্তি হতে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হবেনা। অথবা কোন ব্যক্তি কারো সাথে বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়। অথবা কারো সাথে শরীকদারীর ব্যবসা করতে চায় বা কোন কিছু আমানত রাখতে চায় এবং সে এবিষয়ে কারো কাছে পরামর্শ চায়, তখন তার দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ দোষগুন যা সে জানে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া তার কর্তব্য- ওয়াজিব। যেন সে অজ্ঞতার কারণে প্রতারিত না হয়।

(ঙ) যেসব লোক সমাজে ফিসক-ফুজুরী তথা শরীয়াতের সীমা লংঘন ও পাপ প্রবণতার প্রচার করে বা বিদায়াত ও গুমরাহীর প্রসার করে অথবা জনগণকে বে-দ্বীনি ও জুলুম-অত্যাচারের, অনাচার-অবিচারের কবলে নিক্ষেপ করার কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আওয়াজ তোলা এবং তাদের দোষ ক্রটির তীব্র সমালোচনা করা শুধু জায়েযই নয় বরং অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ।

(চ) কোন লোক যদি খারাপ উপনামে, প্রখ্যাত হয়ে থাকে এমনভাবে যে ঐ নামে ডাকা না হলে তাকে চিনতে পারা যায়না তবে তাকে সেই উপনামে স্মরণ করা জায়েয। কিন্তু তা তাকে হেয় করা উদ্দেশ্য নয় নিছক পরিচিতি দানই হবে উহার উদ্দেশ্য।

এসব সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া কারো অনুপস্থিতিতে তার বিষয়ে খারাপ কিছু বলা সম্পূর্ণ হারাম। এসব খারাপ কথা সত্যভিত্তিক হলে তা হবে 'গীবত' আর মিথ্যা বা ভিত্তিহীন হলে হবে 'বুহতান'। দুই ব্যক্তিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে হলে হবে 'চোগলখুরী' শরীয়াত এই তিনটিকেই হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি মুসলিম নাগরিকের কর্তব্য হল এই অপরাধগুলো প্রতিরোধ করা, যারাই একাজে উদ্যত হয়েছে তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখানো এবং এই গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেয়া। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে 'গীবত' করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে একাজটির জঘন্যতা ও বিভৎসতাকে প্রকট করে তুলে ধরা হয়েছে। মৃতের গোশত খাওয়া স্বতঃই একটি ঘৃণ্য ও হীন কাজ। এখানে আবার সেই গোশত কোন পশুর নয় মানুষের আর সে মানুষও অন্য কেহ নয় তারই আপন ভাই। এই তুলনাকে একটি প্রশ্নবোধক ভংগিতে পেশ করে একে অধিক কার্যকর ও তীব্রতর বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে যে প্রতিটি ব্যক্তিই যেন নিজের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে কি? যদি তা না থাকে এবং তার অন্তরের প্রকৃতিই একে ঘৃণা করে তাহলে সে তার ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার মান সম্ভ্রমের উপর কি করে অকারণ আক্রমণ করতে পারে এমন অবস্থায় যে, সে সেখানে উপস্থিত নেই সে কথার প্রতিবাদ করার জন্য।

www.nagorikpathagar.org

এমনকি তার মানসম্মান যে নষ্ট হচ্ছে যে কখনও সে জানতে পারেনা। কথা বলার ধরণ হতে ইহাও জানা যায় যে গীবত হারাম হওয়ার কারণ স্বরূপ একথা বলা হয় নাই যে, উহার ফলে লোকদের মনে কষ্ট দেয়া হয়। যার গীবত করা হচ্ছে। বরং কোন লোকের অনুপস্থিতিতে গীবত করা স্বতঃই একটা খারাপ কাজ সে জানতে পারুক আর নাই পারুক। এবং একাজের ফলে সে মনোকষ্ট পাক বা নাই পাক। বস্তুত মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এইজন্য হারাম নয় যে মৃত ব্যক্তি এজন্য কষ্ট পায়। কোন ব্যক্তির মারা যাওয়ার পর তার লাশ ছিড়ে ছিড়ে খাওয়া হচ্ছে একথা সে আদৌ জানতে পারেনা। কিন্তু একাজটি স্বতঃই জঘন্য। অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে সে হয়তো সারা জীবনেও জানতে পারবেনা যে কোন ব্যক্তি কোথায় এবং কখন কোন সব লোকের সামনে তার মান সম্মানের উপর আক্রমণ চালিয়ে ছিল এবং এর ফলে কোন কোন লোকের দৃষ্টিতে সে অত্যন্ত হীন ও অপমানিত হয়েছিল। এই অনবহিতি ও অজ্ঞানতার দরুন এই গীবতের কারণে সে কোন কষ্টই পাবে না। কিন্তু এর ফলে তার মান-সম্মান ক্ষুন্ন হবে। একারণে একাজটি মূলত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া হতে ভিন্ন প্রকৃতির নয়।

পরিশেষে বলা হয়েছে "আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী" অতএব গীবতকারী ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হল সে গুনাহ করছে বা করে বসেছে এমন অনুভূতি তার মনে যখনই জেগে উঠবে তখনই আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা এবং এই হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। অতঃপর দ্বিতীয় কর্তব্য হল এই অপরাধের যথাসাধ্য ক্ষতি পূরণ করা। সে যার গীবত করেছে, যাদের সামনে করেছে তাদের সামনে উহা প্রত্যাহার করা এবং এজন্য ক্ষমা চাওয়া। আর মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকলে তবে তার জন্য খুব বেশী বেশী করে মাগফিরাতের দোয়া করা কর্তব্য। বিশেষজ্ঞদের মধ্য হতে কারো কারো মত হল ক্ষমা চাইবে শুধু তখন যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতে পারে। নচেত কেবল তাওবা করেই ক্ষ্যান্ত হবে। আর যদি সে না-ই জানে তবে ক্ষমা চাইতে গিয়ে তার অধিক মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

অতএব আমাদের কর্তব্য এই আয়াতে বর্ণীত তিনটি মারাত্মক গুনাহ-

(১) বেশী বেশী (খারাপ) ধারণা অনুমান করা (২) অপরের গোপনীয় বিষয়ের পেছনে লেগে থেকে তা উদঘাটন করা এবং (৩) গীবত বা অপরের অনুপস্থিতিতে নিন্দা করা-থেকে বিরত থাকা।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূল (মুহাম্মদ সঃ) এর প্রতি ঈমান আন। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুন অংশ দান করবেন। তোমাদেরকে নূর দান করবেন যার

www.nagorikpathagar.org

تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. ٢٨

সাহায্যে তোমরা পথ চলবে। এবং তোমাদের অপরাধ মাফ করে দেবেন। এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। সূরা (৫৭) হাদীদ, আয়াত-২৮।

☆ আলোচ্য আয়াতে "ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু" বলে কাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এব্যাপারে দুটি মত পাওয়া যায় (১) এই আয়াতে সেই লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর ঈমান এনেছিল। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, এখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর ঈমান আন। এর দরুন তোমরা দ্বিগুন সওয়াব পাবে হযরত ঈসার উপর ঈমান আনার।

(২) এখানে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা কেবল মুখে মুখে ঈমান এনে ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়োনা। অন্তরের ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত ঈমান আন, এবং ঈমান আনার হক আদায় কর, মর্যাদা রক্ষা কর। এর ফলে তোমরা দু'ধরনের সুফল পাবে একটি সুফল কুফর ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করার, আর দ্বিতীয় হল ইসলামের ব্যাপারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা গ্রহণের, উহাতে দৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকার। প্রথম তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় সূরা কাসাস এর ৫২ নং আয়াতে। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণীত একটি হাদীস হতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত রাসূল করীম (সঃ) বলেছেন তিনজন লোকের জন্য দুইধরনের বা দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। তন্মধ্যে একজন লোক হলো আহলে কিতাবের যে লোক পূর্ববর্তী নবী (আঃ) এর প্রতি ঈমান রাখত সে যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতিও ঈমান আনে (বুখারী ও মুসলিম)। দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায় সূরা সাবা ৩৭ নং আয়াতে উহাতে বলা হয়েছে নেককার মুমিনদের জন্য দ্বিগুণ সুফল রয়েছে। তাই বলা যায় যুক্তি প্রমাণের দৃষ্টিতে দু'টি তাফসীরই যথার্থ এবং সমানভাবে যুক্তি সংগত। কিন্তু এর পরবর্তী কথা বিবেচনা করলে মনে হয় দ্বিতীয় তাফসীরই এখানে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরং এই সূরাটির সমগ্র বক্তব্য প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এই তাফসীর (দ্বিতীয়) এর সমর্থক। শুরু হতে এ সূরাটিতে সম্বোধন করা হয়েছে সে লোকদেরকে যারা রাসূলে করীম (সঃ) রিসালাতের প্রতি ঈমানের স্বীকৃতি ও ঘোষণা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আর সমগ্র সূরাতেই তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন শুধু মুখে মুখে ঈমান আনার লোক না হয়- কেবল মৌখিক ঈমানদার না হয়। বরং তারা যেন পুরোপুরি নিষ্ঠা সহকারে অন্তরের সাথে ঈমান গ্রহণ করে। অতঃপর বলা হয়েছে আল্লাহ দুনিয়ায় জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির নূর দান করবেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও ব্যাপারে জাহেলিয়াতের বেঈমানী ও কুফরীর বাঁকা চোরা

www.nagorikpathagar.org

অসংখ্য পথের মাঝখান দিয়ে ইসলামের সত্য সঠিক ঋযু পথ কোনটি তা এই নূরের আলোকে তোমরা প্রতি পদে পদে স্পষ্ট দেখতে পাবে। আর পরকালে সেই নূর দান করবেন যার উল্লেখ এই সূরার ১২ নং আয়াতে করা হয়েছে- "আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে তাদের সম্মুখভাবে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি (নূর) ছুটো ছুটি করবে।"

অতঃপর বলা হয়েছে ঈমানের দাবী পূরণ করার নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবীয় দুর্বলতা সমূহের কারণে যে অপরাধই তোমার দ্বারা সংঘটিত হবে তা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। আর সেই অপরাধও ক্ষমা করে দেবেন যা ঈমান গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা অবস্থায় তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

অতএব আমাদের কর্তব্য আন্তরিকভাবে ঈমান আনা, যাতে মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোন পদস্খলন অথবা ছোটখাট ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে আল্লাহপাক তা মাফ করে দেন এবং আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করেন।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ. ٩

হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কানাকানি কর তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূল (সঃ) এর অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করোনা বরং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে কানাকানি কর। আল্লাহকে ভয় কর যার কাছে তোমাদেরকে (হাশরের দিন) একত্রিত হতে হবে। সূরা (৫৮) মুজাদালা, আয়াত-৯।

☆ আলোচ্য আয়াতে 'নাজওয়া' বা কানাকানি, গোপন পরামর্শ- মূলত কোন দোষের কাজ নয়, নিষিদ্ধ নয়। এধরনের কথা যারা বলে তাদের উদ্দেশ্য ও চরিত্রের ভিত্তিতেই এর জায়েয হওয়া না হওয়া নির্ভর করে। সাধারণতঃ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয় অন্ধকারের কাজ যেগুলো মানুষকে লুকিয়ে করতে হয়। কিন্তু কিছু কিছু ভালো কাজও আছে যেগুলোকে গোপনে করা যায়। যেমন দান সদকা অথবা খারাপ কাজের প্রতিরোধ অথবা অন্ধকারের কাজগুলোর পরিকল্পনা নস্যাৎ করা। সিদ্ধান্তকারী বিষয়- সিদ্ধান্তকারী বিষয় হচ্ছে উদ্দেশ্য। সে কি কোন খারাপ কাজ করছে অথবা একটি আইনানুগ আদেশ অমান্য করছে অথবা সে কোন ভাল কাজ করছে যেটা সে বিনয়ের কারণে অথবা নিজের নাম প্রকাশে অনিহা হেতু এটা জানতে দিতে চায়না। অথবা কোন ধ্বংসাত্মক কাজের

www.nagorikpathagar.org

মূল উৎপাটনের উদ্দেশ্যে কাজ করছে যেটা করতে গিয়ে তার নিজেরও বিরাট আত্মত্যাগ করা লাগতে পারে।

এই পর্যায়ে রাসূল করীম (সঃ) যেসব মজলিশী রীতি-নীতি ও আদব কায়দার শিক্ষা দিয়েছেন তা এই ঃ "তিনজন লোক একত্রে বসা থাকলে তাদের দুজন যেন পরষ্পর গোপন পরামর্শে লিপ্ত না হয়। তা করা হলে তৃতীয় ব্যক্তি দুঃখিত হবে।" বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী আবু দাউদ। অপর একটি হাদীসের ভাষা হল ঃ "দুজন লোক যেন পরষ্পর গোপন পরামর্শ না করে। অবশ্য তৃতীয় জনের অনুমতিক্রমে তা হতে পারে। কেননা ইহা তাহার দুঃখের কারণ হয়ে থাকে।"

দুজন লোক কোন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে যদি এমন ভাষায় কথা বলতে থাকে যা সেই তৃতীয় ব্যক্তি বুঝেনা, তবে ইহাও গোপন নিষিদ্ধ পরামর্শের পর্যায়ে পড়ে। ইহা অপেক্ষা অধিক না জায়েয কাজ হল গোপন পরামর্শের সময় অন্য কারো প্রতি তাকানো। কিংবা ইশারা ইংগিত করা- যার দরুন মনে হবে যে তার কথাই আলোচনা হচ্ছে। পরিশেষে সকল আমলের প্রাণশক্তি- আল্লাহর ভয় করার কথা বলা হয়েছে। কারণ আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরুক থাকলে এবং পরকালে হাশরের মাঠে এর জবাব দিতে হবে এই চিন্তা মনে থাকলে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে যে কাজই করুকনা কেন তা অবশ্যই কল্যাণের কাজ হতে বাধ্য। আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ভয়ও থাকবে আবার খারাপ কাজও জেনে বুঝে করবে এটা কখনো সম্ভব নয়।

অতএব আমাদের কর্তব্য গোপনে বা প্রকাশ্যে যে কাজই করিনা কেন তা যেন অবশ্যই কল্যাণকর কাজ হয় এবং সকল কাজে তাকওয়া অবলম্বন করা এবং হাশরের মাঠে জবাবদিহীতার ভয় করা।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ، وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ، وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ، وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. ١١

হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। যখন বলা হয় উঠে যাও তখন উঠে যেও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞান প্রাপ্ত আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর। সূরা (৫৮) মুজাদালা ঃ আয়াত-১১।

www.nagorikpathagar.org

☆ আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের সর্বপ্রকার সভা-সম্মেলন ও বৈঠক, মজলিশ সম্পর্কে একটি সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) ইসলামী আদর্শবাদী লোকদেরকে সে আদব কায়দা ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন তন্মধ্যে একটি কথা এই যে কোন বৈঠকে আগে থেকেই যখন কিছু লোক আসীন থাকবে এবং পরে কিছু লোক আসবে তখন পূর্ব থেকে আসীন লোকদের মধ্যে এতটা ভদ্রতা থাকা বাঞ্ছনীয় যে, তারা নিজেরাই নবাগত লোকদের জন্য বসবার স্থান করে দেয়। এবং যতটা সম্ভব কিছুটা গুটিয়ে বসে তাদের জন্য খানিকটা প্রশস্ততা করে দেবে। আর পরে আসা লোকদের মধ্যেও এতটা শিষ্টাচার থাকা উচিত যে, তারা জোর পূর্বক তাদের মধ্যে ঢুকে পড়বেনা এবং কেউ অন্য কাউকেও তার আসন থেকে তুলে দিয়ে সেখানে বসতে চেষ্টা করবেনা। হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন, "দু'জন লোকের মাঝে তাদের অনুমতি ছাড়া ঢুকে পড়া কারো জন্য হালাল নয়।" (বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)। অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করলে আল্লাহপাক তাদের জন্য প্রশস্ততা দান করার ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালের জন্যতো বটেই দুনিয়াতেও জীবন জীবিকার জন্যও হতে পারে।

আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) এর মজলিশে লোকেরা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে থাকত। এর ফলে অনেক সময় নবী করীম (সঃ) এর বিশেষ অসুবিধা হত। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য নির্দেশ নাযিল হয়েছে- "তোমাদেরকে যখনই উঠে যেতে বলা হবে, তোমরা তখনই উঠে যাবে।" ইবনে জরীর (রঃ) ইবনে কাছীর (রঃ) নবী করীম (সঃ)-এর দরবারে অন্যদের জায়গা দেয়ার উদ্দেশ্যে তুমি নিজেই যদি উঠে গিয়ে কিছুটা দুরে গিয়ে বস তাহলে মর্যাদা লাঘব হল এরূপ মনে করোনা। কিংবা বৈঠক শেষ করে দিয়ে তোমাকে চলে যেতে বলা হলেও তোমার অবমাননা হয়ে গেল এরূপ মনে করারও কোন কারণ নেই। বস্তুত মর্যাদা বৃদ্ধির আসল উপায় হল ঈমান ও ইলম। মজলিশে নবী করীম (সঃ) এর নিকট কে বসতে পারল, কে তাঁর নৈকট্যে অধিকক্ষণ বসে থাকার সুযোগ পেল- এই হিসেবে তো কারো মর্যাদা বৃদ্ধি পায়না। বরং মর্যাদা তারই হবে যে ঈমান ও ইলমের দৌলত অর্জন করেছে। পক্ষান্তরে যে কেউ নবী করীম (সঃ) এর মজলিশে অধিকক্ষণ বসে থেকে তাঁকে কষ্ট দিল সেতো উল্টো মুর্খের মত কাজ করল। সে বেশীক্ষণ নবী করীম (সঃ) এর দরবারে বসে থাকার সুযোগ পেল কেবল এ কারণেই তো তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারেনা। আল্লাহর নিকট তার অপেক্ষা অধিক মর্যাদাতো সেই ব্যক্তির যে নবী করীম (সঃ) এর সাহচর্যে থেকে ঈমান ও ইলমের মূলধন সংগ্রহ করল এবং মুমিন উপযোগী চরিত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারল। যদিও এটা রাসূল (সঃ) এর মজলিশ সম্পর্কে বলা

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে তবুও সকল প্রকার ইসলামী মজলিশ সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। আমরা নেতৃবৃন্দের সময়, সুযোগ ও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। এবং তাঁদের বিরক্তি উৎপাদনকারী অথবা অসুবিধা সৃষ্টিকারী কাজকর্ম পরিহার করে বরং তাদের থেকে উপদেশ, উদাহরণ গ্রহণ করে নিজেদের কাজ, ইলম ও আমলকে উন্নত করা উচিত।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَـٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ١٢

হে মুমিনগণ! তোমরা রাসূল (সঃ) এর কাছে কোন কথা (গোপন কথা) বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান কর। এটা তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভালো উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। সূরা (৫৮) মুজাদালা ঃ আয়াত-১২।

☆ আল্লাহর রাজ্যে সকল প্রকার শিক্ষা ও পর্যালোচনা সকলের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু মানুষের স্বভাব দুর্বল। মানুষ চায় বিশেষ শিক্ষা ও পর্যালোচনা ব্যক্তিগতভাবে তার শিক্ষক তথা রাসূল (সঃ)এর সাথে। এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন- (১) তারা ভাবতে পারে যে তাদেরটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা যেটা তারা সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করতে চায়না। (২) তাদের স্পর্শকাতরতা অথবা বিশেষ আত্মমর্যাদা বোধ থাকতে পারে যেটা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোচনার দ্বারাই তৃপ্তি পেতে পারে (৩) এমনকি তারা শিক্ষক তথা রাসূল (সঃ) এর সময়কে এককভাবে পাওয়ার মত স্বার্থপরতায়ও ভুগতে পারে। এগুলো পর্যায়ক্রমে বর্জনীয়; তথাপিও মানুষের দুর্বলতা বিবেচনায় এগুলো এতবেশী তিরস্কারযোগ্য নয় যে তাদেরকে উন্নয়নের সুযোগ না দিয়ে এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হবে। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে- তারা যেন এ ধরনের একাকীত্বে রাসূল (সঃ) এর সাথে কথা বলার আগে নিজেদের গরীব ভাইদের জন্য কিছু দান করে । ফলে তারা এ ধরনের একাকীত্বে গোপন কথা বলার আগে চিন্তা করতে বাধ্য হলো এধরনের কথা বলার যৌক্তিকতা কতটুকু। এবং স্বভাবতই মানুষের যেহেতু অর্থ সম্পদের প্রতি মোহ বেশী তাই তারা এধরনের সুযোগ গ্রহণ করা থেকে তথা রাসূল (সঃ) এর মূল্যবান সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকল। এটা যেহেতু তাদের ক্ষমাযোগ্য একটি লঘু অপরাধের লঘু শাস্তি তথা জরিমানা তাই তারা জরিমানা দিয়ে নিজেদের অপরাধ কিছুটা ঢাকতে পারত। এতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অপরাধ সংশোধিত হয়ে গেল। এখানে লক্ষণীয়, আয়াতটিতে এধরনের দান

www.nagorikpathagar.org

বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কারণ যারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল তাদের জরুরী কথা বলা থেকে তারা যেন বিরত থাকতে বাধ্য না হয়। এজন্যই এব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের কাজ হয়ে গেল। যখন লোকজন নিজেদের ভুল বুঝতে পারল এবং সংশোধিত হয়ে গেল তখন পরবর্তী আয়াতে এ প্রথা রহিত করে দেয়া হল। হাদীস থেকে এ প্রথার কার্যকারিতার মেয়াদ সর্বোচ্চ দশদিন বলে জানা যায়।

অতএব প্রয়োজন ব্যতীত ব্যস্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সময়কে একাকীত্বে পাওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া উচিত নয় বরং উচিত তাদের মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوْا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. ١٨

হে মুমিনগণ! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করছে তা চিন্তা করা। আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। সূরা (৫৯) হাশর ঃ আয়াত-১৮।

☆ আলোচ্য আয়াতে কিয়ামাত বুঝাতে "লিগাদ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ আগামী কাল। এতে তিনটি ইংগিত রয়েছে (১) সমগ্র ইহকাল পরকালের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময় অর্থাৎ একদিন বা তার চেয়েও কম সময়। কেননা পরকাল চিরন্তন যার কোন অন্ত বা শেষ নেই। এর তুলনায় দুনিয়ার জীবন যত দীর্ঘই হোকনা কেন তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। প্রকৃত পক্ষে তার তুলনাই হয়না। সমুদ্রের পানির সাথে যেমন একফোটা বা কয়েক ফোটা পানির তুলনা হয়না ঠিক তেমনি।

(২) কিয়ামত অত্যন্ত সুনিশ্চিত, যেমন আজকের পর আগামী কালের আগমন সুনিশ্চিত। (৩) কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামী কাল যেমন অতি নিকটবর্তী। তেমনি দুনিয়ার জীবনের পর কিয়ামতও খুবই নিকটবর্তী।

এই আগামী কাল কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে- যে ব্যক্তি আজকের আনন্দ স্ফূর্তি ও স্বাদ আস্বাদনের জন্য নিজের সবকিছু ঢেলে দেয়, আগামীকাল তার নিকট ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাবার ও মাথা গুজার জন্য ঠাঁই থাকবে কিনা তা চিন্তা করেনা সে লোকটি যেমন অজ্ঞ, মুর্খ ও অপরিণামদর্শী তেমনি সেই লোকটিও নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারে। অপরিণামদর্শী, অজ্ঞ ও মুর্খ যে নিজের ইহ জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ বানাতে ব্যস্ত হয়ে পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ রূপ ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে যায়, পরকালকে ভুলে যায়। অথচ

www.nagorikpathagar.org

আজকের পর যেমন আগামী কাল অবশ্যই আসবে তেমনি পরকালও অবশ্যই আসবে। বর্তমানের দুনিয়ার জীবনেই যদি সে আগামী কালের (পরকালের) জন্য ব্যবস্থা না করে তাহলে 'পরকালের' সেই আগামী কাল সে কিছুই পেতে পারবেনা।

এর সংগে আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল, এই আয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের হিসাব গ্রহণকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি স্বয়ং নিজের ভালোমন্দ নিজেই বুঝতে না পারে তাহলে তার বর্তমান জীবনের কার্যাবলী তার পরকালীন জীবনকে সুন্দর ও সুখময় বানাবে, না মারাত্মক পরিণতির ব্যবস্থা করবে এর কোন চেতনাই তার জাগবে না, থাকবেও না। কিন্তু এচেতনা যদি জাগ্রত হয় তাহলে তাকে নিজের হিসেব নিজেকেই গ্রহণ করতে হবে এবং করবে। এবং নিজের সময়, পূজি, শ্রম-মেহনত, যোগ্যতা কর্মক্ষমতাকে যে পথে ও যে কাজে নিয়োজিত করেছে ও করছে তা তাকে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছাবে না জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে তা পূর্ণ বিচক্ষণতা সহকারেই তাকে বিচার করতে হবে। দেখতে হবে, বস্তুত এরূপ বিচার বিবেচনা করা ও দেখা তার নিজের স্বার্থেরই ঐকান্তিক দাবী। যদি সে তা না দেখে ও বিবেচনা না করে তবে সে নিজেই নিজের ভবিষ্যত নষ্ট করে দেবে।

আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করার জন্য দুই দুইবার আল্লাহকে ভয় করার কথা তথা 'তাকওয়ার' কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই তাকওয়া অবলম্বন করতে চাই তবে অবশ্য অবশ্যই পরকালের জন্য কি প্রেরণ করছি তার হিসেব-নিকেশ, চুলচেরা বিশ্লেষণ করব। এমন যেন না হয় যে, আশাতো করব অনেক কিছু, কিন্তু কাজ করব আশার বিপরীত। আর তাকওয়ার দাবীই হলো আশার অনুরূপ কাজ করা। অর্থাৎ পরকালে আমরা যদি কল্যাণ পেতে চাই এবং আমার বিশ্বাস আমরা অবশ্য অবশ্যই তা চাই, তবে পরকালীন কল্যাণের জন্যই আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আর পরকালীন কল্যাণ কে না চায়?

পরিশেষে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে আমরা যা কিছু করি আল্লাহ তা জানেন ও খবর রাখেন। অর্থাৎ সে অনুযায়ীই তিনি প্রতিফল দেবেন। অতএব আমাদের কর্তব্য হল আমাদের চিন্তা ও কর্মকে আখিরাতমুখী করা, হাশরমুখী করা। এবং সেই দিনের জন্য কি সঞ্চয় করছি তার হিসাব এখনই করা।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِّنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তোমরাতো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও অথচ তারা যে

www.nagorikpathagar.org

الْحَقِّ، يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ، إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِيْ، تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ. ١

সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তা অস্বীকার করছে। তারা রাসূল (সঃ) কে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে (?) যে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্য বের হয়ে থাক তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সূরা (৬০) মুমতাহানা ঃ আয়াত-১।

☆ আলোচ্য আয়াতটি হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতায়ার (রাঃ) লিখা একটি গোপন চিঠির কারণে নাযিল হয়েছিল। তিনি মদিনায় মুহাজির ছিলেন। মক্কায় তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা কল্পে তিনি মুশরিক কুরাইশদের কাছে এই গোপন চিঠিটি লিখেছিলেন। গোপন চিঠিটি পাকড়াও করা হয়েছিল এবং তিনি এটা স্বীকারও করেছিলেন। তাঁকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল যেহেতু তিনি সত্য স্বীকারও করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য বিদ্রোহাত্মক বলে প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু তারপরও এই নির্দেশ ভবিষ্যত দিক নির্দেশনার জন্য (তথা আমাদের জন্য) দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতটি যদিও মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে তথা মক্কায় অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে নাযিল হয়েছিল তথাপিও এটার বিষয়বস্তু সার্বজনীন। মুমিনদের কেহ নিজ জনসাধারণ এবং বিশ্বাসের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখতে পারবেনা। কারণ তারা তাদের বিশ্বাসকেই ধ্বংস করতে চায়। তাদের প্রতি দোষারোপ করে এবং তাদেরকেও ধ্বংস করতে চায়। অতএব এ ধরনের কাজ নিজের আত্মীয়-স্বজনের খাতিরেও করা যাবেনা। নিজের জন্যও করা যাবেনা। যেহেতু এতে নিজের পুরো কওমকেই বা গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করে দেবে।

আলোচ্য আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে 'কাফের' শব্দের পরিবর্তে "আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু" বলা হয়েছে। এতে এই নির্দেশের কারণ ও দলীল-প্রমাণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহর শত্রুদের কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়। অতএব এথেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়ত এই দিকেই ইংগিত করা হয়েছে যে,

www.nagorikpathagar.org

কাফের যে পর্যন্ত কাফের থাকবে সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারেনা। যে আল্লাহর দুশমন অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম আহকামের বিরোধিতাকারী, আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহর পছন্দনীয় জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হোক এটা চায়না এবং সর্বশক্তি দিয়ে এ বিধান প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব যে মুসলমান আল্লাহর মুহাব্বাত দাবী করে তার সাথে কাফেরের বন্ধুত্ব কিভাবে সম্ভব?

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রাসূল (সঃ) কে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিস্কার করেছে। এ বহিস্কারের কারণ পার্থীব নয়, নয় কোন বিষয় সম্পত্তি বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব একথা আর গোপন রইলনা যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারেনা। হযরত হাতিব (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তাঁর পরিবার পরিজনের হেফাযত করবে। তাঁর এই ধারণা ভ্রান্ত ছিল। কারণ ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। আল্লাহ না করুন তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্ব আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

অতঃপর কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহরই জন্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, তাঁর দ্বীন কায়েমের জন্য ছিল, তবে আল্লাহর শত্রুদের তথা অমুসলিম ও কাফেরদের কাছে এই আশা কিরূপে করা যায় যে তারা তোমাদের খাতির করবে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপন বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজ কর্মের খবর রাখেন। এপর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে এবং পরবর্তী কয়েকটি আয়াতেও এ প্রসংগে যা বলা হয়েছে তা যদিও হযরত হাতীব (রাঃ) এর এই ঘটনা প্রসংগেই অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র তাঁরই সম্পর্কে কথা বলার পরিবর্তে এতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের প্রতি চিরকালের জন্য একটি শিক্ষা সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। আর তা'হল যেখানেই কুফর ও ইসলামের মুখোমুখি ও সাংঘর্ষিক অবস্থা এবং যেখানেই কিছু সংখ্যক লোক মুমিন লোকদের সাথে শুধুমাত্র তাদের মুসলমান হওয়ার কারণেই শত্রুতা করতে থাকে, সেখানেই কোন ব্যক্তির কোন উদ্দেশ্য এবং কল্যাণ কামনার ভিত্তিতেই এমন কোন কাজ করা যাতে ইসলামের স্বার্থ ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং কুফর ও কাফিরদের স্বার্থের আনুকুল্য হয়- ঈমানের পরিপন্থী কাজ। কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের অকল্যাণ কামনা হতে মুক্ত হয়ে এবং কোন অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে নিজের ব্যক্তিগত কোন বৃহত্তম স্বার্থের কারণে একাজ করে তবুও কোন মুমিনের পক্ষে একাজ শোভনীয় নয়। আর যে লোকই একাজ করেছে বুঝতে হবে সে সত্য সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অতএব আমাদের কর্তব্য ইসলামের বিপক্ষে নিজের কোন বৃহত্তম ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেও কুফরী শক্তির অনুকূল কোন কাজ না করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ
الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ،
اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ، فَاِنْ
عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ
فَلَاتَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ، لَاهُنَّ
حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ،
وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا، وَلَاجُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ
اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ
وَلَاتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ
اَنْفَقُوْا، ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ، يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ، وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ. ١٠

হে মুমিনগণ! ঈমানদার মহিলারা যখন হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে তখন তাদের (মুমিনা হওয়ার ব্যাপারটি) পরীক্ষা করে নাও। আর তাদের ঈমানের প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। তোমরা যদি নিঃসন্দেহে জানতে পার যে, তারা মুমিনা তাহলে তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফিরিয়ে দিওনা। না তারা কাফেরদের জন্য হালাল না কাফির পুরুষরা তাদের জন্য হালাল। তাদের কাফির স্বামীরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছিল তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে বিবাহ করায় কোন দোষ নেই, যদি তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করতে দাও। আর তোমরা নিজেরাও কাফির মহিলাদেরকে নিজেদের বিবাহ বন্ধনে আটকিয়ে রেখোনা তোমরা যা কিছু তোমাদের কাফির স্ত্রীদের দিয়েছ তা ফেরত চেয়ে নাও। আর যে মোহরানা কাফিররা তাদের মুসলিম স্ত্রীদেরকে দিয়েছে তারাও যেন তা ফেরত চেয়ে নেয়। ইহা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞানী। সূরা (৬০) মুমতাহানা ঃ আয়াত-১০।

☆ আলোচ্য আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতদ্বয় হুদাইবিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্ক যুক্ত। সূরা ফাতহ্ হতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সন্ধি চুক্তির একটি শর্ত কুরাইশ কাফিরদের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছিল যে, "মক্কা থেকে কোন লোক যদি মদীনায় চলে আসে তবে তাকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মদীনা থেকে কেহ মক্কায় চলে গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবেনা।" সন্ধির এই কথাগুলো কাফিরদের প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর যে ভাষায় লিখেন তা হলো-

www.nagorikpathagar.org

عَلٰى اَنْ لَايَاتِيْكَ مِنْ اَرَجُلُ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَّدْتَهُ اِلَيْنَا.

"তোমাদের নিকট আমাদের কোন পুরুষও যদি আসে - তোমাদের ধর্মমতের হলেও, তোমরা তাকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠাবে।" সন্ধির একথাগুলো বুখারী শরীফের কিতাবুস শুরুত, বাবু শুরুত ফিল জিহাদ ওয়াল মুসালাহা অনুচ্ছেদে মজবুত সনদ সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। সুহাইল হয়ত 'রিজালু' কথাটি ব্যক্তি অর্থে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ইহা ছিল তার নিজের চিন্তা। আরবী ভাষায় এটি সাধারণত পুরুষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই কারণে মুসলিম মহিলা "উম্মে কুলসুমকে (রাঃ)" ফেরত নেয়ার দাবী সহ যখন তাঁর আত্মীয়েরা হাজির হল তখন রাসূল করীম (সঃ) তাঁকে ফেরত দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন শর্ত ছিল পুরুষদের সম্পর্কে স্ত্রী লোকদের সম্পর্কে নয়। (তাফসীরে কবীরা, ইমাম রাজী, আহকামুল কুরআন- ইবনে আরাবী)। সেই সময় পর্যন্ত কুরাইশদের মধ্যে ধারণা ছিল সন্ধির শর্ত স্ত্রী-পুরুষ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু নবী করীম (সঃ) যখন সন্ধির এই শব্দের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তখন তারা হতবাক হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হল।

সন্ধির এই শর্তানুযায়ী যে স্ত্রীলোকই মক্কা হতে মদীনায় আসবে যে উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন তাকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানানোর পূর্ণ অধিকার মুসলমানদের ছিল। কিন্তু মুমিন মহিলাদের সংরক্ষণই ছিল ইসলামের অধিক আগ্রহের ব্যাপার। যে কোন পলায়ন পর স্ত্রী লোকের জন্য মদীনাকে একটি আশ্রয় শিবিরে পরিণত করা ইসলামের উদ্দেশ্য ছিলনা। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন, যে স্ত্রীলোকেরাই হিজরত করে আসবে ও মুমিনা হওয়ার দাবী করবে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে প্রকৃত ঈমানদার কি না, ঈমান রক্ষার উদ্দেশ্যে সে এসেছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। আর এদিক দিয়ে যখন কারো সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ হবে তখন তাকে ফিরিয়ে দেয়া যাবেনা। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য একটা পদ্ধতি রচনা করা হলো যেসব স্ত্রীলোক হিজরত করে আসত সে আল্লাহর একত্ব ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রিসালাতের প্রতি ঈমানদার কিনা? এবং কেবল মাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর জন্য দেশ ত্যাগ করেছে কি-না? এবিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। স্বামী বিরাগী হয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে কিনা? এখানকার কোন মুসলমানের প্রেমে পড়ে আসে নাই তো! অথবা অন্য কোন বৈষয়িক স্বার্থ তাকে এখানে নিয়ে আসেনি তো! যেসব মহিলা এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারত কেবল মাত্র তাদেরকেই মদীনায় অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হতো। অতঃপর তাদেরকে এই সূরার ১২ নং আয়াত অনুযায়ী শপথ পাঠ করানো হতো। এভাবেই কোরানের এই আয়াত "ঈমানদার মহিলারা যখন

www.nagorikpathagar.org

হিজরত করে আসবে তখন তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও” এর বাস্তবায়ন করা হতো। অতঃপর আল্লাহ এটাও জানিয়ে দিচ্ছেন যে তাদের অন্তরের ব্যাপারটা তোমাদের সাধ্যের বাহিরে। সুতরাং এটা আল্লাহর উপরই ছেড়ে দাও।

অতঃপর বলা হয়েছে “ঈমানদার নারীরা কাফের পুরুষদের জন্য হালাল নয় এবং কাফের পুরুষরাও তাদের জন্য হালাল নয়।” এই আয়াত ব্যক্ত করছে যে, যে নারী কোন কাফেরের বিবাহাধীন ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে তারা একে অপরের জন্য হারাম। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, মুহাজির মুসলমান নারীর কাফের স্বামী বিবাহের মহরানা ইত্যাদি বাবত যা কিছু ব্যয় করেছে তা সবই তার প্রাক্তন স্বামীকে ফেরত দাও। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই সম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে তোমরা ফেরত দাও। কারণ স্বামী প্রদত্ত ধনসম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেয়ানো সম্ভব নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। যদি বায়তুল মাল থেকে দেয়া সম্ভব হয় তবে সেখান থেকে অথবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেয়া হবে। অতঃপর বলা হয়েছে নতুন করে মহরানা ধার্য করা সাপেক্ষে এই নারীদের সাথে যে কোন মুসলমানের বিবাহ হতে পারে। যদিও প্রাক্তন কাফের স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়। অতঃপর মুসলমান পুরুষদেরকে জানানো হয়েছে যদি তাদের বিবাহ বন্ধনে কোন কাফের স্ত্রী থেকে থাকে তবে তাদের বন্ধন শেষ করে দেয়া হল। এখন কোন মুসলিম পুরুষের সাথে কোন মুশরিক নারীর বিবাহ বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে। এখনো কোন মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হালাল নয়। অতঃপর বলা হয়েছে মুসলমান কোন নারীকে মক্কায় (কাফের স্বামীর কাছে) ফেরত পাঠানো হবেনা। এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত পাঠানো হবে। এমনিভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফের থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর সাথে সম্পর্কছেদ হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার দেয়া মোহরানা ফেরত দেয়া কাফেরদের দায়িত্ব হয় তখন পারস্পরিক সমঝোতা এবং বুঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেনদেনের মীমাংসা করে নেয়া কর্তব্য। উভয়পক্ষ যে মোহরানা দিয়েছে তা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী লেনদেন করে নেয়া উচিত। কিন্তু বাস্তব সমস্যা যেটা, সেটা হলো মুসলমানরাতো কাফেরদেরকে তাদের প্রাপ্য অর্থ সম্পদ যেভাবেই হোক ফেরত দিয়ে দেবে। কিন্তু কাফেররাতো কিছুতেই মুসলমানদের প্রাপ্য অর্থ-সম্পদ দিতে চাবেনা। সেক্ষেত্রে কি করা হবে? এর জওয়াব পরবর্তী আয়াতে দিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে মুসলমান স্বামীদের যে পরিমাণ মোহরানা ইত্যাদি কাফের স্ত্রীদের থেকে প্রাপ্য সে পরিমাণ অর্থ

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম স্ত্রীদের থেকে প্রাপ্য কাফের স্বামীদের থেকে কেটে রেখে সেটা মুসলিম স্বামীদেরকে দিয়ে দিতে হবে। এরপর যদি কাফের স্বামীরা আরো পাওনা থাকে তখন সেটা আদায় করে দিতে হবে। এভাবে হিসাব নিকাশে ভারসাম্য রাখতে হবে। অথবা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে মুসলিম স্বামীদের প্রাপ্য মোহরানার অর্থ দিয়ে দিতে হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন পরিকল্পিত ভাবে করা ও করানো হচ্ছে। কাফের এবং মুসলমান নামধারীদের মধ্যে মিক্সড বিবাহ হচ্ছে যেটা এই আয়াতে অত্যন্ত জোরালো এবং সুস্পষ্ট ভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অতএব আমাদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত যাতে কোন মুসলমান ভুলে এই ফাঁদে পা না দেয়। এবং কুরআনের আয়াত লংঘন করে কুফরীতে লিপ্ত হতে না পারে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ. ١٣

হে মুমিনগণ! আল্লাহ যে জাতির উপর গযব নাজিল করেছেন তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা। তারা পরকাল সম্পর্কে তেমনি নিরাশ যেমন করবে সমাধিস্ত কাফেররা নিরাশ। সূরা (৬০) মুমতাহিনা ঃ আয়াত-১৩।

☆ এ সূরার প্রথম থেকে যে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে সেটা উপসংহার টানা হয়েছে। আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়া উচিত নয়, যারা আল্লাহর আইন ভংগ করে এবং আল্লাহর আইনে বিদ্রোহী। এই প্রশ্নেরই বিভিন্ন দিক নিয়ে এই সূরায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এবং তার আইনগত দিক সমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে এ আয়াতে যুক্তির সমাপ্তি টানা হয়েছে। যারা পরকালে বিশ্বাস করেনা তাদের এই জীবনের পর কোন আশা ভরসা থাকতে পারেনা। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে এই জীবনটাই দুঃসহ। কারণ এই জীবনের যন্ত্রণা ও দুঃখটাই তাদের কাছে আসল। এবং এর কোন উপসম বা পরিত্রাণ তাদের জানা নেই। যারা পরকালের আযাবকে অস্বীকার করে এই জীবনে পাপে ডুবে থাকে এবং দুনিয়াটাকে "খাও, দাও স্ফুর্তি কর" এমন জায়গা মনে করে তাদের অবস্থাও অনুরূপ; যদিও তারা ঐশী গ্রন্থের অনুসারী হওয়ার বা না হওয়ার দাবী করুক, যদিও তারা পরকালে বিশ্বাস করে। এটা তাদের জন্য আতঙ্ক শাস্তি এবং হতাশার জীবন। কিন্তু বিশ্বাসী তথা ঈমানদারদের অবস্থা বিপরীত। তারা এই জীবনে কষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের জন্য এই জীবনটা চোখের পলক যেটা অতি শীঘ্রই পার হয়ে যাবে। প্রকৃত বাস্তবতা হল পরকালীন জীবন, তাদের সবকিছু আশা ভরসা, চাওয়া পাওয়া সেখানে।

www.nagorikpathagar.org

ফলে এখানে কোন দুঃখ কষ্টই তাদের জন্য কোন দুঃখ কষ্ট নয়। কোন অপূর্ণতাই তাদের অপূর্ণতা নয় এবং কোন কঠিনতম বিপদেও তারা হতাশ হয়ে পড়েনা। এই আয়াতে অত্যন্ত চমৎকার একটি উপমা দিয়ে এটা বুঝানো হয়েছে। পরকাল অস্বীকারকারীরা পরকালীন কল্যাণ ও সওয়াব হতে তেমনিভাবে নিরাশাগ্রস্থ যেমন করে তারা নিরাশা গ্রস্থ যে তাদের নিকট আত্মীয় স্বজন যারা মরে গিয়েছে তারা কখনো পুনরুজ্জীবিত বা পুনরুত্থিত হবে। অথবা এটাও হতে পারে যে তারা পরকালীন রহমত মাগফিরাত হতে ঠিক তেমনি নিরাশ, যেমন কবরস্থ কাফিররা নিরাশ। কেননা তারা যে আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে সে বিষয়ে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَاتَفْعَلُوْنَ. ٢

হে মুমিনগণ! তোমরা সে কথা কেন বল যা কার্যত করনা? সূরা (৬১) সফ ঃ আয়াত-২।

☆ আলোচ্য আয়াতটির শানে নযুল থেকে জানা যায় এটি বিশেষ ঘটনার প্ররিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোর সাথে একসাথে মিলিয়ে পড়লেই সেই ঘটনা ও বক্তব্যটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এছাড়াও এই আয়াতের একটি সাধারণ বক্তব্য আছে যা ব্যবহৃত শব্দগুলো থেকেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথমত যে সব ইসলামের জন্য আত্মদান ও চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকারের লম্বা ও বড় বড় ওয়াদা করে কিন্তু বাস্তব পরীক্ষার সময় পিঠটান দেয় তাদেরকে তিরস্কার করাই এই আয়াতের উদ্দেশ্য। ওরা আসলে দুর্বল ঈমানের লোক। কোরআনের বেশ কয়েকটি স্থানে বলিষ্ঠভাবে এই দুর্বলতার সমালোচনা করা হয়েছে। সূরা নিসার ৭৭ নং আয়াত, সূরা মুহাম্মদের ২০ নং আয়াত, সূরা আল ইমরানের ১৩ থেকে ১৭ রুকু পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। তাফসীরকারকগণ এই আয়াতসমূহের শানে নযুল বর্ণনা প্রসংগে সেই দুর্বলতা সমূহের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরেছেন- এখানে যেগুলো সম্পর্কে পাকড়াও করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, জিহাদ ফরজ হওয়ার পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে কিছুলোক বলত, হায়! আমরা যদি সে কাজটি জানতে পারতাম যা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় তাহলে আমরা তা-ই করতাম। কিন্তু যখন বলে দেয়া হল সে কাজটি হল জিহাদ, তখন তাদের বলা কথাই পূর্ণ করা তাদের জন্য বিশেষ কষ্টকর হয়ে গেল। মুকাতিল ইবনে হাইয়ান বলেন ওহুদ যুদ্ধে এসব লোক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। তারা নবী করীম (সঃ) কে ছেড়ে পালিয়ে গেল। তাদেরকেই আলোচ্য আয়াতে তিরস্কার করা হয়েছে।

আর আয়াতটির সাধারণ বক্তব্য এই যে, সাচ্চা মুসলমানের কথা ও কাজে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য -সঙ্গতি থাকা আবশ্যক। সে যা বলবে তাকে তা করে দেখাতে হবে। বলা

www.nagorikpathagar.org

এক আর করা অন্য, এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের স্বভাব। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য। আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবীদার ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বদস্বভাব কখনোই শোভা পেতে পারেনা। নবী করীম (সাঃ) এর ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন যে কারো মধ্যে এরূপ বদ স্বভাবের অবস্থিতি এমন একটা নিদর্শন যা প্রমাণ করে যে সে মুমিন নয় মুনাফিক। হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেছেন- "মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা কথা বলে। (২) ওয়াদা করলে পূরণ করেনা। (৩) কোন কিছু তার কাছে আমানত রাখলে তাতে সে খেয়ানত করে। (বুখারী শরীফ)। মুসলিম শরীফে এই হাদীসে অতিরিক্ত অংশ ঃ সে যদি নামাজ রোজা করে ও নিজেকে মুসলমান মনে করে তবুও সে মুনাফিক। অন্য একটি হাদীসে রাসূল (সঃ) বলেছেন চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে যে পুরাপুরি মুনাফিক একটি স্বভাব অবশ্যই পাওয়া যাবে যতক্ষণ না সে এটা পরিহার করবে। (১) আমানত রাখা হলে খিয়ানত করবে। (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে (৩) ওয়াদা করলে এর বিরোধিতা করবে (৪) যখন লড়াই ঝগড়া করবে তখন নৈতিকতা ও বিশ্বাসপরায়নতার সমস্ত সীমা লংঘন করে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)। বস্তুত কোন লোক যদি আল্লাহর নিকট কোন ওয়াদা করে (যেমন কোন মানত মানে) কিংবা মানুষের সাথে কোন চুক্তি করে, কিংবা কারো নিকট কোন প্রতিশ্রুতি দেয়, কিছু করার ওয়াদা করে তাহলে তা পালন করা ওয়াজিব। তবে যে কাজটার ওয়াদা করা হয়েছে সে কাজটাই যদি মূলত গুনাহর কাজ হয় তাহলে সে কাজটাতো করা যাবেনা, কিন্তু তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কসমের কাফফারা দিতে হবে। সূরা মায়েদার ৮৯ নং আয়াতে এই কাফফারার কথা বলা হয়েছে।

অতএব আমাদের কর্তব্য আমরা চিন্তাভাবনা করে কথা বলব এবং যে কথা বলব সেটা কার্যে পরিণত করব।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ ١٠

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে। সূরা (৬১) সাফ্ফ ঃ আয়াত-১০

☆ ব্যবসা বলা হয় কোন কাজ বা জিনিসের বিনিময়ে অন্যকোন জিনিস যেটা আশা করা হয়, তা লাভ করাকে। ব্যবসা এমন জিনিস যাতে মানুষ নিজের মূলধন, সময়, শ্রম, মেধা ও যোগ্যতা নিয়োজিত করে মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে। আলোচ্য আয়াতে একটি চমৎকার উপমার সাহায্যে মুমিনের কাজ ও তার ফলাফলকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শুধু মাত্র মূল উপমা তথা ব্যবসার কথা বলেই শেষ করা হয়েছে। এই

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসার মূলধন কি সেটা বলা হয়নি। পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ ১১ নং আয়াতে এই মূলধনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে "তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সঃ) এর প্রতি। আর জিহাদ কর নিজেদের ধনমাল ও জান-প্রাণ দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জান।" এখানে তিনটি মূলধনের কথা বলা হয়েছে (১) ঈমান (২) ধনমাল ও (৩) জান-প্রাণ এবং এসবগুলো নিয়োজিত করতে হবে জিহাদের জন্য। এবং বলা হয়েছে এই যে বিনিয়োগ ব্যবসা এটা দুনিয়ার যাবতীয় ব্যবসার থেকে উত্তম কিন্তু সেটা বুঝার ব্যাপার আছে। এখানে ঈমানদার লোকদেরকে আবার ঈমান আনতে বলা হয়েছে অর্থাৎ খাঁটি নিষ্ঠাবান মুমিন হওয়ার জন্য বলা হয়েছে। ঈমানের শুধু মৌখিক দাবীই যথেষ্ট নয় বরং যে জিনিসের প্রতি ঈমানের দাবী করা হয় সেই জিনিসের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ ও দুঃখকষ্ট স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হও। ব্যবসার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে যে যতবেশী মূলধন বিনিয়োগ করে যার চেষ্টা যত্ন যত বেশী তার লাভও হয় তত বেশী। তাই এই চমৎকার উপমাটির সাহায্যে মুমিনদেরকে আহ্বান করা হয়েছে তাদের ধনমাল, জান-প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার জন্য।

বাস্তবিকই চমৎকার ব্যবসা। কত সামান্য বিনিয়োগ আর তা-ও মূল মালিক যিনি সাধারণ আমানতদারদেরকে তাঁরই পথে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন এবং পুরস্কারও অতুলনীয়, লাভ সীমাহীন। পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ ১২ ও ১৩ নং আয়াতে এই লাভের থতা বলা হয়েছে "আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্ খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাত দেবেন যে সবের নীচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত । এক চিরকালীন বসতির স্থান জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। ইহাই বিরাট সাফল্য। আর দ্বিতীয় যে জিনিসটি তোমরা চাও, তাও তোমাদেরকে দেবেন, আল্লাহর সাহায্য ও খুব নিকটবর্তী বিজয়।" আমরা যদি একটু চিন্তা করি আমরা কি বিনিয়োগ করছি, ক্ষণস্থায়ী জীবন, তার চেয়েও ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল মাল সম্পদ আর পরিণামে কি পাচ্ছি- জান্নাতের চিরসুখের জীবন এবং অনন্ত অশেষ নিয়ামাতরাজী। এটাতো শুধু লাভের হিসাব। আর যে ক্ষতি থেকে নিস্কৃতি পাচ্ছি তা কি কোন অংশে কম? চিরস্থায়ী আজাব ও শাস্তি থেকে পরিত্রান। এটাতো হলো পরকালীন জীবনের পুরস্কার। স্বভাবতই খুবই দুর্বলমনা এক তাড়াহুড়াকারী তাই তাদের জন্য আরো একটি লাভ ও পুরস্কারের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেটা কুরআনের ভাষায় –"তোমরা পছন্দ কর" আল্লাহর সাহায্য এবং নিকটবর্তী বিজয়।" আমরা যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ করি, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পাব। আর আমাদেরকে যতবেশী প্রতিকূলতার সম্মুখীনই হতে হোকনা কেন, আমরা অবশ্যই সাহায্যে বিজয়

www.nagorikpathagar.org

লাভ করব। রাসূল (সঃ) এর জামানায় এবং সাহাবীদের (রাঃ) জীবনে এর হাজারো উদারহণ রয়ে গেছে। আজো আমরা যদি তাঁদের সেই ঈমান ও আন্তরিকতা নিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে নিশ্চয়ই বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে। আর সবচেয়ে বড় পুরস্কার পরকালের সেই অনন্ত জীবনের জান্নাত তো রয়েছেই। এ কথাগুলো সূরা তাওবার ১১১নং আয়াতেও বর্ণনা করা হয়েছে।

অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর শিখানো এই ব্যবসায় সর্বস্ব বিনিয়োগ করা। যাতে আমরা সবেচেয়ে বেশী লাভবান হতে পারি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْآ اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّنَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ، قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَامَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِى اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ، فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ امَنُوْا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ. ١٤

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) হাওয়াগণকে(তাঁর শিষ্যগণকে) বলেছিলেন, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবেন তখন জাওয়ারীগণ জবাব দিয়েছিলেন আমরা আছি আল্লাহ পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ঈসরাইলের একদল ঈমান আনল আর অন্যদল কুফরী করল। যারা ঈমান এনে ছিল আমি তাদেরকে শত্রুদের মুকাবেলায় সাহায্য করলাম। ফলে তারাই বিজয়ী হয়ে থাকল। সূরা (৬১) সাফ্ফ ঃ আয়াত-১৪

☆ কুরআন মজিদের অন্যান্য যায়গার মত এখানেও সেসব লোকদেরকে আল্লাহর সাহায্যকারী নামে অভিহিত করা হয়েছে যারা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান জানায় এবং কুফরীর মুকাবেলায় আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায়। আল ইমরান ৫২, হজ্জ-৪০, মুহাম্মদ -৭, হাদীদ - ২৫ ও হাশর-৮ আয়াতে একই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজে যখন সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকুলের উপর অনির্ভরশীল, মুখেপেক্ষীহীন, সকলেই তাঁর উপর নির্ভরশীল ও তাঁর মুখাপেক্ষী, তখন কোন বান্দার পক্ষে তাঁর সাহায্যকারী হওয়া কিরূপে সম্ভব? নিম্নে এর কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া যাচ্ছে ঃ

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কোন কাজের ব্যাপারে তাঁর কোন বান্দাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সেই লোকদেরকে সেই কারণে আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে- মূলতই একথা

www.nagorikpathagar.org

সত্য নহে। বস্তুত জীবনের যে যে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা নিজে মানুষকে কুফর ও ঈমান, আল্লাহনুগত্য ও নাফরমানী করার স্বাধীনতা দান করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তি দ্বারা জবরদস্তিমূলকভাবে তাদেরকে ঈমানদার ও অনুগত বানান না। বরং তাঁর নবী রাসূল ও নিজের প্রেরিত কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে সত্য দ্বীনের পথে পরিচালিত করার জন্য উপদেশ নসীহত শিক্ষাদান, ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করেন। এই উপদেশ নসিহত, শিক্ষাদান, বুঝানোকে যে লোক নিজের সন্তুষ্টি ইচ্ছা ও আগ্রহে কবুল করে সে মুমিন। যে লোক কার্যত অনুগত হয় সে মুসলিম, আবেদ ও কানেত। যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে সে মুত্তাকী। যে লোক নেক আমল সমূহের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয় সে মুহসিন। আর এসব হতেও এক কদম সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে যে লোক এই শিক্ষাদান ও উপদেশ নসীহতের সাহায্যে আল্লাহর বান্দাহগনের সংশোধন বিধানের জন্য এবং কুফর ও ফাসিকীর(বিরুদ্ধে) পরিবর্তে আল্লাহর আনুগত্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজ করতে শুরু করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা "আনসারুল্লাহ" তথা নিজের সাহায্যকারী বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই সাহায্যদানের তাৎপর্য নিশ্চয়ই এটা নহে যে, এই লোকেরা আল্লাহর নিজের এমন কোন প্রয়োজন পূরণ করছেন। যা তিনি পূরণ করতে পারেননা বলে এদের উপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছেন। বরং এটা এই অর্থে যে এই লোকেরা সেই কাজে অংশগ্রহণ করে যে কাজ আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তির সাহায্যে করার পরিবর্তে নিজের নবী, রাসূল ও আসমানী কিতাব সমূহ ও তার অনুসারীদের সাহায্যে সুসম্পন্ন করতে চান।

হাওয়ারী অর্থ আন্তরিক বন্ধু ও নিঃস্বার্থ সমর্থক, সাহায্যকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারো চূড়ান্ত পর্যায়ের সাহায্য সহযোগিতা করে সে তার হাওয়ারী। যারা ঈসা (আঃ) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে সর্বাবস্থায় সংগ দেয়ার এবং সাহায্য করার অংগীকার করেছিল কুরআন তাদেরকে হাওয়ারী বলে অভিহিত করেছে।

বনী ইসরাইলের একদল লোক যারা সত্যের প্রতি নিবেদিত ছিল তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছিল। কিন্তু অধিকাংশ ছিল কঠিন হৃদয়ের এবং তারা তাদের মিথ্যা অহংকার ও গোত্র প্রীতিতে লিপ্ত ছিল। অধিকাংশ লোকের এদলই প্রথমত বিজয়ী বলে মনে হচ্ছিল যখন তারা মনে করেছিল যে ঈসা (আঃ)কে তারা ক্রসে বিদ্ধ করে তাঁর দাওয়াতকে শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু তারা অচিরেই হুশে ফিরে আসল এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। খ্রীষ্টীয় ৭০ অব্দে জেরুজালেম টাইটাস কর্তৃক ধ্বংস হয়ে যায় এবং এরপর থেকেই ইহুদীরা চিরকালের জন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অপর পক্ষে ঈসা (আঃ) এর উপর ইমান আনয়নকারীরা রোমান সম্রাজ্যের সাথে মিলিত হয়ে অনেক গোত্র এবং

www.nagorikpathagar.org

জাতিকে নিজেদের অনুসারী করে তোলে এবং ইসলাম ধর্ম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্টান ধর্মই প্রধান ধর্ম হিসেবে বিরাজিত ছিল।

অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা যদি সত্যাশ্রয়ী হয় তারা অবশ্যই বিজয়ী থাকবে। বদর যুদ্ধে, খন্দক যুদ্ধে মুশরেক ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে, কাদশিয়া এবং মাদায়েনে অগ্নীপূজকদের বিরুদ্ধে এবং ইয়ারমূক এ রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোতো হলো বাহ্যিক বিজয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক বিজয় এগুলোর মত চিহ্নিত না হলেও যেভাবে পাদ্রীদের অহমিকা এবং ক্ষমতা ধ্বংস হয়েছে যেভাবে অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাস সমূহ বিলুপ্ত হয়েছে এবং যেভাবে মানুষের ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা, নারীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও স্বচ্ছতা চিহ্নিত হয়েছে, জ্ঞানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিজ্ঞানের উন্নতি এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এগুলো সবই ইসলামেরই অবদান এবং ইসলামের বিজয়ের ফলেই হয়েছে। আল্‌কুরআন এখানে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে যে, অতীত যেমন ঈসা (আঃ) এর উপর ঈমান আনয়নকারী সম্প্রদায় তথা খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা তাঁকে অস্বীকারকারী ইহুদীদের উপর বিজয় লাভ করেছে এবং বিজয়ী থেকেছে অনুরূপভাবে বর্তমানেও মুহাম্মদ (সঃ) এর উপর ঈমান আনয়নকারীরাই এবং তাঁর সত্যিকার অনুসারীরাই তাঁকে অমান্যকারী লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. ٨

হে মুমিনগণ! জুমআর দিনে যখন নামাজের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে দৌড়াও এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ। সূরা (৬২) জুম'আ ঃ আয়াত-৯।

☆ জুমআ মূলত একটি ইসলামী পরিভাষা, জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসীরা একে "ইয়াউমু আরূবা" বলত। ইসলামে এ দিনটিকে যখন মুসলমানদের একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল তখনই ইহার নামকরণ হয় 'জুম'আ'। ইহা প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের সমাবেশের দিন, সাপ্তাহিক সমাবেশ। এদিন তারা একত্রিত হয়ে নিজেদের একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরো জোরদার করে। এই দিনের সামষ্টিক এবাদাত তথা জুম'আর নামাজে ইমাম সাহেব অর্থাৎ সমাজের নেতা সাপ্তাহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের পর্যালোচনা করেন এবং একে আরো উন্নত ও সুসংহত করার জন্য উপদেশ এবং আহ্বান জানান। এখানে মুসলমানদের পারস্পরিক সামাজিক ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ়

www.nagorikpathagar.org

করার যে চমৎকার ব্যবস্থা তা লক্ষণীয়। প্রত্যহ তারা পাঁচবার মসজিদে একত্রিত হয়ে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সপ্তাহে একবার প্রত্যেক গ্রাম শহর অথবা বড় শহর এর ওয়ার্ড এর কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম'আর নামাজ আদায় করেন। এবং এটা একটা স্থানীয় সমাবেশ যেখানে বর্তমানে পরিস্থিতির আলোচনা করে ইমাম তথা নেতা দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বৎসরে দুইবার দুই ঈদে আরো বৃহত্তর অংগনে একত্রে সমাবেশ কেন্দ্রীয় ঈদগাহে মিলিত হন। এবং সর্বোপরি জীবনে কমপক্ষে একবার মক্কায় সারা বিশ্বের মুসলমানগণ কেন্দ্রীয় সম্মেলনে একত্রিত হন। এবং এই বিশ্বসম্মেলন- হজ্জ প্রতি বৎসরই অনুষ্ঠিত হয়। এখানে একটি চমৎকার একত্রিকরণ ও পৃথকীকরণ এর সুখী ও সুন্দর বিন্যাস লক্ষণীয়। এটা অত্যন্ত সহজেই পালন করা যায়। এর মাধ্যমেই আরো বৃহত্তর এবং কঠিন সংগ্রামের স্তরে পরস্পরের একতা, ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক আলোচনা এবং যৌথ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি।

মুসলমানদের সাপ্তাহিক দিন 'জুমাবার' এবং ইহুদীদের সাববাত - 'শনিবার' ও খ্রীষ্টানদের 'রোববার' এক নয়। ইহুদীদের সাববাত হচ্ছে তাদের দৃষ্টিভংগী- আল্লাহর সৃষ্টি কাজ শেষে বিশ্রাম গ্রহণের স্মরণে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভংগী- আমাদের শিক্ষা এর বিপরীত। আমরা জানি আল্লাহ পাকের বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। এবং তাঁকে কোন কিছু ক্লান্ত শ্রান্ত করতে পারেনা। ইহুদীদের ঐদিন কোন প্রকার কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ, কিন্তু ঐদিন ইবাদাত বন্দেগী সম্পর্কে তাদের ধর্মগ্রন্থ নীরব। পক্ষান্তরে আমাদের জুমাবারের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে এবাদাত বন্দেগী এবং এর জন্য দিক নির্দেশনা। যদিও খ্রীষ্টানরা ইহুদীদের শনিবার থেকে রোববার দিনকে পরিবর্তন করেছে কিন্তু তাদের ভাবধারা একই রয়ে গেছে। শুধুমাত্র এটাকে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রূপ দেয়া হয়েছে। অথচ আমাদের পবিত্র কুরআন নির্দেশ দেয় যখন 'জুমআর' নামাজের আযান দেয়া হয় তখন তোমরা ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ কর এবং ছুটে এস আন্তরিকতা ও আনুগত্য নিয়ে এবাদাত কর। পারস্পরিক দেখা সাক্ষাত এবং পরামর্শের মাধ্যমে সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন কর। অতঃপর এই সম্মেলন শেষে আবারো পৃথিবীতে রুজী রোজগারের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়। এখানে মূল আয়াতে যদিও বেচা-কেনা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু এর অর্থ কেবলমাত্র বেচাকেনা বন্ধ করা নয় বরং খুৎবা শোনা ও নামাজের জন্য যাওয়ার চিন্তা ও ব্যবস্থা ছাড়া অন্য সকল প্রকার চিন্তা ও ব্যস্ততা ছেড়ে দেয়ার নির্দেশই এখানে দেয়া হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে এটাই আমাদের জন্য উত্তম যদি আমরা বুঝি। অর্থাৎ আমাদের আসল সম্পদতো পরকালীন সম্পদ তথা ইবাদাত বন্দেগী। অতএব এটাই আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অতএব নির্দিষ্ট যে মৌলিক ইবাদাতগুলো রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে কোন

www.nagorikpathagar.org

কাজে লিপ্ত থাকা যাবেনা। বরং সেই ইবাদাতগুলোর সময়ে অন্যান্য সকল কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآاَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ. ٩

হে মুমিনগণ! তোমাদের সন্তান সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল না করে। যারা এরূপ করবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্থ। সূরা (৬৩) মুনাফিকুন ঃ আয়াত-৯।

☆ এসূরার প্রথম রুকুতে মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্তের উল্লেখ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত হয়ে পড়াই এর মূল কারণ। এ কারণেই একদিকে তারা মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে সুযোগ সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে বাহ্যত মুসলমান বলে প্রকাশ করত। অতঃপর এখানে মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে তোমরা মুনাফিকদের মত দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেওনা। এখানে ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই জন্য যে মানুষ বেশীরভাগ এদের স্বার্থেই ঈমানের দাবী পূরণ ও দায়িত্ব পালন হতে মুখ ফিরিয়ে, মুনাফেকী, ঈমানের দুর্বলতা কিংবা ফাসেকী নাফরমানীর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু আসলে এখানে দুনিয়ার সে সব কিছুকেই বুঝানো হয়েছে যা মানুষকে নিজের মধ্যে এতটুকু মশগুল করে রাখে, যার ফলে সে আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফিল হয়ে যায়। মূলত এই ভুলে যাওয়া ও আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল হয়ে যাওয়া সমস্ত দুষ্কর্মের মূল কারণ। মানুষ মোটেও স্বাধীন নহে, এক আল্লাহর বান্দাহ আর আল্লাহ তার কাজকর্ম পুরাপুরি জানেন। এবং একদিন তার সামনে গিয়ে মানুষকে নিজের সমস্ত কাজ কর্মের হিসেব দিতে হবে। একথা যদি মানুষের মনে থাকে ভুলে না যায় তাহলে কোন প্রকার গুমরাহী বা পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

মানবীয় দুর্বলতার কারণে কখনো পদস্খলন ঘটে গেলেও হুশ ফিরে আসার সাথে সাথে সে নিজেকে সামলে নেয়। ফলে ভুল পথ ত্যাগ করে সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে। আয়াতে একথা বলা হয়নি যে ধনমালের এবং সন্তান সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয় বরং ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। আল্লাহর স্মরণ-এ প্রত্যেক কল্যাণ, সেবা, মহৎ চিন্তা, মহৎ কাজ অন্তর্ভূক্ত। কারণ এটাই হল সেবা এবং উৎসর্গ যেটা আল্লাহ আমাদের কাছে চান। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন স্মরণ অর্থ যাবতীয় আনুগত্য ও এবাদাত এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই, ক্ষতি

www.nagorikpathagar.org

আমাদের নিজেরই অন্য কারো নয়। কারণ এটা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বন্ধ করে দেয়, জান্নাতের পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ، وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. ١٤

হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রীগণ! ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে কতিপয় তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর তোমরা যদি ক্ষমা কর, উপেক্ষা কর এবং দোষক্রুটি ঢেকে রাখ তবে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াময়। সূরা (৬৪) তাগাবুন ঃ আয়াত-১৪।

☆ আল্লাহর পথে চলার ব্যাপারে বহুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে নিজের স্ত্রী-সন্তান হতে এবং বহু সংখ্যক স্ত্রীলোককে নিজের স্বামী ও সন্তান হতে পিতা-মাতাকে তাদের সন্তান হতে এবং সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতা হতে অসংখ্য প্রকার দুঃখ কষ্ট, বিপদ, অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষের পক্ষে এমন স্ত্রী পাওয়া বা স্ত্রীর পক্ষে এমন স্বামী পাওয়া যে, ঈমান ও সততার জীবন যাপনে পরস্পর পূর্ণমাত্রায় সহযোগী ও সাহায্যকারী হবে এবং এরপর তাদের সন্তানদেরর আকীদা, বিশ্বাস, আমল ও চরিত্র স্বভাবে তাদের মনমত ও চোখের শীতলতা হবে। এমনটি খুব কমই ঘটে থাকে। সাধারণত দেখা যায় স্বামী ঈমানদার চরিত্রবান হলে স্ত্রী ও সন্তান এমন হয় যারা তার ঈমানদারী, সততা ও বিশ্বস্ততাকে নিজেদের দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে। তারা চায় স্বামী বা পিতা তাদের জন্য এমন কাজ করুক যার ফলে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পাবে- পরিণামে তাকে জাহান্নামে যেতে হলেও তাতে তাদের কোন আপত্তি নেই। এর বিপরীত মুমিন স্ত্রীলোক এমন স্বামীর পাল্লায় পড়ে যে, তার শরীয়ত পালন করে চলা স্বামীর মোটেই সহ্য হয়না। সন্তানরা অসদাচারী পিতার পদাংক অনুসরণ করে ও অসৎকর্মে লিপ্ত হয়ে মায়ের জীবনকে দুঃসহ করে তোলে। অনুরূপভাবে অনেক সন্তান পিতা-মাতার কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়। বিশেষত কুফরী ও ঈমানের দ্বন্দে ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব হল আল্লাহ তাঁর দ্বীনের খাতিরে সর্বপ্রকার ক্ষতি ও দুঃখ বিপদ সহ্য করতে প্রস্তুত থাকা। কারাবরণ কিংবা দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হলেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেনা প্রকৃত ঈমানের এটাই দাবী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেই একজন ঈমানদার স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানেরা স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী ও সন্তানরা এবং সন্তানদের ক্ষেত্রে পিতা মাতা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামী সমাজেও এ ধরনের অবস্থা অনেক দেখা যায়।

www.nagorikpathagar.org

আয়াতটি নাযিল হওয়া কালীন সময়ে বহু সংখ্যক ঈমানদারের জীবনে তদানিন্তন বিশেষ অবস্থায় যে বিশেষ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল, বর্তমান সময়েও অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণকারী বহুলোকের জীবনে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। তদানিন্তন মক্কা ও আরবের অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণত এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল যে, একজন পুরুষ ঈমান আনল, কিন্তু স্ত্রী-পুত্র পরিজন যে শুধু ঈমান আনতে প্রস্তুত নয় তা-ই নয় বরং তাকেই ইসলাম থেকে বিরত রাখার বা ফিরিয়ে নেয়ার জন্য দিনরাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সেসব মহিলারা এবং সন্তানরাও যারা নিজেদের সমাজ পরিবেশে একাই ইসলাম গ্রহণ করত ও ঈমানের পথে চলতে চাইত।

এসকল অবস্থার সম্মুখীন ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে আলোচ্য আয়াতে তিনটি কথা বলা হয়েছে- প্রথমত বলা হয়েছে যে, বৈষয়িক সম্পর্ক ও আত্মীয়তার দৃষ্টিতে যদিও এই লোকেরা সর্বাধিক প্রিয়জন। কিন্তু দ্বীন ও ইসলামের দৃষ্টিতে এরা তোমাদের শত্রু। অবশ্য সে শত্রুতা কয়েক প্রকার হতে পারে। তারা তোমাদেরকে নেক কাজ থেকে বিরত রাখতে ও পুনরায় কুফরীর দিকে টানতে পারে। অথবা হতে পারে তাদের সদিচ্ছা সহানুভূতি হবে কুফরীর প্রতি আর তোমাদের কাছে মুসলমানদের যুদ্ধ সংক্রান্ত অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোন গোপন তথ্য জানতে পারলে তারা ইসলামের দুশমনদের কাছে পৌঁছতে পারে। এ ধরনের কাজে মূল শত্রুতার স্বরূপ ও অবস্থায় বা মাত্রায় তো পার্থক্য হতে পারে। কিন্তু আসলে এতো শত্রুতাই। ঈমান যদি তোমাদের অধিকতর প্রিয় বস্তু হয়ে থাকে তাহলে এসব দিক দিয়েই তাদেরকে শত্রু মনে করাই কর্তব্য। তাদের প্রেম ভালবাসায় পড়ে তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফরের কিংবা আল্লাহনুগত্য ও আল্লাহর নাফরমানীর দিক দিয়ে যে বিরাট প্রাচীর আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা তোমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। অর্থাৎ তাদের বৈষয়িক সুখ সুবিধা বিধান করতে গিয়ে স্বীয় পরকাল পরিণতি বরবাদ করোনা। তাদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা এতটা বেশী পোষণ করোনা যার ফলে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর সাথে তোমাদের সম্পর্ক রক্ষা ও ইসলাম পালনের পথে তারা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাদের প্রতি এতটা নির্ভরতা রেখনা যার ফলে তোমার অসতর্কতার সুযোগে মুসলিম সমাজের গোপন তত্ব জানতে পেরে শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিতে পারে। রাসূল (সঃ) একটি হাদীসে বলেছেন- "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে, বলা হবে এর সন্তান সন্ততিরা তার সব নেক আমল খেয়ে ফেলেছে।"

www.nagorikpathagar.org

পরিশেষে বলা হয়েছে- "আর তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতার ব্যবহার কর ও ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান। এর অর্থ এই যে তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে শুধু তোমাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে। যেন তোমরা সতর্ক থাক এবং দ্বীন ইসলামকে তাদের ক্ষতি হতে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা কর। এর মূলে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। তোমরা স্ত্রী-পুত্রকে মারপিট করবে কিংবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে বা দুর্ব্যবহার করবে অথবা তাদের সাথে সম্পর্ক এতটা তিক্ত করবে যার ফলে তোমাদের ও তাদের পারিবারিক জীবনই দুঃসহ হয়ে উঠবে- এটা কখনই উদ্দেশ্য নয়। কেননা তা করা হলে দুটো বিরাট ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। একটি এই যে এর ফলে স্ত্রী-পুত্রকে সংশোধন করার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় এই যে সমাজে এর দরুন ইসলামের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি হতে পারে। আশে পাশের লোকেরা মুসলমানদের চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে এরূপ ধারণা করতে পারে যে, ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি নিজের ঘরেও স্ত্রী-পুত্র পরিজনের প্রতি কঠোর ও রূঢ় আচরণকারী হয়ে যেতে হয়।

এ ধরনের সমস্যা সম্পর্কে সূরা আন্ কাবুতের ৮ নং আয়াতে, সূরা লোকমানের ১৪-১৫ নং আয়াতে, সূরা তাওবা ২৩-২৪, সূরা মুমতাহানার ৩ ও মুনাফিকুন-৯ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব আমাদের কর্তব্য নিজ পরিবার পরিজনের ব্যাপারে সতর্ক থাকা যাতে তাদের জন্য ঈমানের ও ইসলামের কোন ক্ষতি না হয় এবং তাদেরকে হেকমতের সাথে সংশোধনের চেষ্টা করা।

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ. ٦

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করা যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, পাষাণ হৃদয় ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করেনা এবং যা করতে আদেশ করা হয় তা-ই করেন। সূরা (৬৬) তাহরীম : আয়াত-৬।

☆ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে কেবলমাত্র নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকবে এবং তার চেষ্টা এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে মুমিন ব্যক্তির কেবলমাত্র এতটুকুই দায়িত্ব নয় বরং সেই সাথে প্রাকৃতিক ব্যবস্থানুযায়ী যে

www.nagorikpathagar.org

পরিবার ও বংশের নেতৃত্বের বোঝা তার উপর অর্পিত হয়েছে যে পরিবার ও বংশের লোকজনকেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আল্লাহর পছন্দের অনুরূপ বানাতে চেষ্টা করে যাওয়াও তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তারা জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে তার পক্ষে যতটা সম্ভব তাদেরকে সেদিক হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাবে। সন্তানাদি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল অবস্থার হবে পিতৃগণের শুধু এই চিন্তাই হওয়া উচিত নয়। সেই সাথে বরং ইহা অপেক্ষাও বেশী চিন্তা করতে হবে তাদেরকে জাহান্নামের ইন্দন থেকে বিরত রাখার জন্য। বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে- রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল এবং নিজের দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। দেশ প্রশাসকও রাখাল সে তার প্রজা সাধারণের ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। স্ত্রী নিজের স্বামীর ঘর সন্তানদের ব্যাপারে দায়ী। সে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহী করবে।

অতঃপর জাহান্নামের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে যে, এর ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। এটা অত্যন্ত মারাত্মক আগুন, এটা সাধারণ আগুনের মত যেটা কাঠ বা কয়লা বা এধরনের জিনিষকে জ্বালায় তা'নয়। এই আগুনের ইন্দন হবে মানুষ যারা পাপ কাজ করবে এবং যাদের অন্তর পাথরের মত কঠিন। অথবা পাথরের মূর্তি যেগুলো জীবনের সকল মিথ্যার প্রতিকৃতি। আমরা সাধারণত চিন্তা করি ফেরেশতারা স্বভাবগতভাবে খুবই নরম স্বভাবের দয়াদ্র এবং সুন্দর। কিন্তু অন্যদিকে তারা ন্যায় বিচারক, বিশ্বস্ত এবং সুশৃংখল এবং অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদেরকে দেয়া আল্লাহর আদেশ সমূহ পালন করেন। এব্যাপারে তাঁরা সামান্য শিথিলতা দেখান না বা আদেশ পালনে সামান্য ক্রটি বা হেরফের করেননা। তাঁরা আল্লাহর আদেশ সমূহ পুংখানুপুংখ রূপে বাস্তবায়ন করেন।

অতএব আমাদের কর্তব্য জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا، عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ، يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা কর আন্তরিক তওবা। আশা করা যায় যে, তোমাদের রব তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহপাক নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের

www.nagorikpathagar.org

اٰمَنُوْا مَعَه، نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا، اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. ٨

নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটা-ছুটি করবে। তারা বলবে হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। সূরা (৬৬) তাহরীম ঃ আয়াত-৮।

☆ তাওবাতান নাসূহ" এর দুটি অর্থ হতে পারে। (১) মানুষ এমন খাঁটি ও অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ তাওবা করবে যাতে লোক দেখানো বা রিয়াকারী, মুনাফেকী বা কপটতার বিন্দু বিসর্গও থাকবেনা। (২) ব্যক্তি নিজে নিজের কল্যাণ কামনা করবে, মংগল চাইবে এবং গুনাহ হতে তওবা করে নিজেই নিজেকে মারাত্মক পরিণতি হতে রক্ষা করবে। অথবা গুনাহর কারণে তার দ্বীন পালনে যে ফাটল ধরে গিয়েছিল তওবা করে এর প্রতিবিধান করবে- মেরামত বা সংশোধন করবে। কিংবা তওবা করে সে নিজের জীবনকে এতটা সুসংগঠিত ও পরিমার্জিত করে নিবে যে-অন্য লোকদের জন্য সে উপদেশ হওয়ার দৃষ্টান্ত হবে। তার দৃষ্টান্ত দেখে অন্য লোকেরাও তারই মত নিজেদের সংশোধন করে নেবে। এই সব অর্থ আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে জানা ও বুঝা যায়। এছাড়াও শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর অর্থ ও তাৎপর্য জানা যায় রাসূল (সঃ) এর হাদীস হতে -রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ "তাওবাতুন নাসূহ এর তাৎপর্য হল, তোমার দ্বারা যখন কোন অপরাধ হয়ে যায় তখন নিজের গুনাহর জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হও এবং এই লজ্জা সহকারে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও আর ভবিষ্যতে কখনো একাজ করোনা।" হযরত আলী (রাঃ) একবার একজন বেদুইন লোককে খুব দ্রুত তাওবা ইস্তিগফার এর শব্দগুলো উচ্চারণ করতে শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন এতো মিথ্যুকের তাওবা। সে জিজ্ঞাসা করল তাহলে সহীহ তাওবা কি? তিনি বললেন এরজন্য ছয়টি জিনিস হওয়া আবশ্যক (১) যা ঘটে গেছে তার জন্য লজ্জিত হবে (২) নিজের যেসব কর্তব্যে অবহেলা দেখিয়েছ তা রীতিমত আদায় কর (৩) যার হক নষ্ট বা হরণ করেছে তাকে তা ফিরিয়ে দাও (৪) যাকে কষ্ট দিয়েছ তার নিকট ক্ষমা চাও (৫) ভবিষ্যতে পুনরায় এ গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প কর। (৬) নিজের সত্তাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত ও নিঃশেষিত কর যেভাবে তুমি আজ পর্যন্ত একে নাফরমানীর কাজে অভ্যস্ত বানিয়ে রেখেছ। একে আল্লানুগত্যের তিক্ত রস পান করাও- যে রকম একে তুমি আজ পর্যন্ত নাফরমানীর মিষ্টতার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছ।

তাওবার ব্যাপারে আরো কয়েকটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। প্রথমত এই যে মূলত তাওবা কোন ব্যাপারে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া - এইজন্য যে উহা আল্লাহর

www.nagorikpathagar.org

নাফরমানীর কাজ। অন্যথায় কোন গুনাহ্‌কে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করে। কোন, দুর্নাম, অখ্যাতি বা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ভয় করে তা পরিহার করার সংকল্প বা ওয়াদা করাকে কখনো তাওবা বলা যায় না। দ্বিতীয়ত যে সময় অনুভূতি জাগবে যে, আল্লাহর নাফরমানী করে বসেছে ঠিক সে সময় তওবা করা কর্তব্য। আর যেভাবেই সম্ভব এর প্রতিবিধান করা কর্তব্য। প্রতিবিধানে টালবাহানা করা অনুচিত।

তৃতীয়তঃ তওবা করে বারবার তওবা ভংগ করা, তওবাকে একটা কৌশল বা খেলায় পরিণত করা এবং যে গুনাহ্ হতে তওবা করেছে বার বার এরই পুনরাবৃত্তি করা তওবা মিথ্যা হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। আর বারবার তওবা ভংগ করা হলে তা তার অন্তরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার ভাব বর্তমান না থাকারই প্রমাণ।

চতুর্থঃ যে ব্যক্তি সাচ্চা মনে তওবা করে পুনরায় সে গুনাহটি না করার দৃঢ় সংকল্প করেছে মানবিক দুর্বলতার কারণে তার দ্বারা যদি সে গুনাহর পুনরাবৃত্তি ঘটে যায়, তাহলে আগের গুনাহটি নতুন হবেনা। অবশ্য পরবর্তী গুনাহর জন্য আবার তাওবা করতে হবে। এবং ভবিষ্যতে আর তওবা ভংগ করবেনা এর জন্য খুব শক্ত প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প করবে।

পঞ্চম এই যে ঃ যখন যখনই নাফরমানীর কথা স্মরণ আসবে তখনই নতুন করে তওবা করা কর্তব্য নয়। কিন্তু তার নফস যদি পূর্বে করা গুনাহ্ স্মরণ করে আনন্দ স্বাদ অনুভব করে তাহলে বার বার তাওবা করা কর্তব্য- যেন শেষ পর্যন্ত গুনাহর স্মৃতি তার জন্য আনন্দের বা স্বাদের পরিবর্তে লজ্জার অনুভূতি জাগ্রত করে। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে তওবা করেছে সে অতীতে কখনো নাফরমানী করেছে বা গুনাহ্ করেছে একথা ভেবে আনন্দ স্বাদ পেতে পারেনা। কেহ যদি আনন্দ-স্বাদ অনুভব করে তবে বুঝতে হবে আল্লাহর ভয় তার মনে মজুবত হয়ে বসতে পারেনি।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে - "আশা করা যায় আল্লাহ্ তোমাদের মাফ করে দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" তওবা করা হলে অবশ্যই মাফ করে দেয়া হবে এবং অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে একথা বলা হয়নি বরং আয়াতে বলা হয়েছে যে সত্যিকার তওবা করলে আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন এরূপ আশা করা যায়। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে গুনাহ্ গারের তাওবা কবুল করা এবং তাকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে জান্নাত দেয়া আল্লাহর কোন কর্তব্য নয় এটা পুরোপুরি তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের ব্যাপারে যে তিনি ইচ্ছা হলে ক্ষমা করবেন এবং পুরস্কারও দেবেন। তাঁর কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা পোষণ করাতো বান্দার অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু গুনাহ্ করলে তিনি মাফ করে দেবেন। এই আয়াতে বলা হয়েছে "যেদিন আল্লাহপাক নবী করীম (সঃ) এবং বিশ্বাসী অনুগামীদের লজ্জিত করবেন না," অর্থাৎ তাঁদের নেক আমলের শুভ প্রতিফলন তিনি বিনষ্ট করবেন

www.nagorikpathagar.org

না। তিনি কাফের ও মুনাফিকদেরকে একথা বলার আদৌ সুযোগ দেবেন না যে তারা আল্লাহর বন্দেগী করে কি ফল পেল? শুধুমাত্র আল্লাহদ্রোহী লোকেরাই লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহর অনুগত ও আল্লাহর বিধান পালনকারী লোকদের ভাগ্যে লজ্জা ও লাঞ্ছনা কখনো আসবেনা। অতঃপর তাদেরকে শুভ সংবাদ শোনানো হয়েছে যে "তাদের অগ্রভাগে ও ডানে নূর দৌড়াতে থাকবে।" সূরা হাদীসের ১২ ও ১৩ নং আয়াতের সাথে মিলালে জানা যায় এই অবস্থা হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতে নেয়ার সময় হবে। যেখানে চতুর্দিকে গভীর নিশ্চিদ্র অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকবে। তখন জাহান্নামী লোকেরা পথ চেনার সময় আঘাতের পর আঘাত পাবে এবং হোচটের পর হোঁচট খেয়ে পড়েব। আর আলো পাবে কেবল ঈমানদার লোকেরা। তারা এই আলোর সাহায্যে নির্বিঘ্নে পথ চলবেন। এই কঠিন নাযুক অবস্থায় ঈমানদার লোকেরা অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদের হাহাকার ও ফরিয়াদ শুনে ভীত বিহ্বল হয়ে পড়েবেন। নিজেদের অপরাধ ও দোষ ক্রুটির তীব্র অনুভূতিতে তারা আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়বেন এই ভেবে যে তাদের নূরও যদি কেড়ে নেয়া হয় এবং তারাও যদি এই হতভাগ্য লোকদের মত হয়ে পড়ে। এই কারনে তারা দোয়া করতে থাকবেন, হে আমাদের রব আমাদের অপরাধ মাফ করে দিন এবং আমাদের নূর জান্নাতে পৌছা পর্যন্ত অব্যাহত ও অক্ষুন্ন রাখুন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), দাহহাক (রঃ) প্রায় এইরূপ তাফসীর করেছেন।

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তাসরীনা বিনতে মুজাহিদ

- সমাপ্ত -

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

"আল কুরআনের অংশবিশেষ,
এগুলো জানার আগ্রহ
প্রত্যেক মুমিনের রয়েছে;
বরং তাদের জীবনকে
প্রকৃত মুমিন হিসেবে গড়তে হলে-
এগুলো জানার কোন বিকল্প নেই।"